আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির সহপাঠ্যরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

ষষ্ঠ শ্রেণি

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ফাতেমা চৌধুরী

ড. সরকার আবদুল মান্নান

জিয়াউল হাসান

নুরুন নাহার

মোঃ মতিউর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৬
সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে সহপাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা সহপাঠ্যপুস্তক 'আনন্দপাঠ' নামে সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ–সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও নানাসূত্রে যেন তাদের পরিচয় ঘটে, সে দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিশ্বসাহিত্য থেকে আটটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিরায়ত জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না সে দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষাগত সহজ সাবলীলতা ও গতিশীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১.	আয়না	জসীমউদ্‌দীন	১-৫
২.	জাদুকর	হুমায়ূন আহমেদ	৬-১৩
৩.	ঋণ পরিশোধ	মোহাম্মদ নাসির আলী	১৪-১৮
৪.	রাখালের বুদ্ধি (ভিনদেশি রূপকথা)		১৯-২১
৫.	বালকের সততা	ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	২২-২৫
৬.	কাঠের পা	আনোয়ারা সৈয়দ হক	২৬-৩০
৭.	চিন্তাশীল (নাটিকা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১-৩৬
৮.	অমি ও আইসক্রিম'অলা	ফরিদুর রেজা সাগর	৩৭-৪৫
৯.	রসুলের দেশে (ভ্রমণকাহিনি)	ইবরাহীম খাঁ	৪৬-৫০
১০.	ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত (ভ্রমণকাহিনি)	মুহম্মদ আবদুল হাই	৫১-৫৫

আয়না

জসীমউদ্‌দীন

এক চাষি ক্ষেতে ধান কাটিতে-কাটিতে একখানা আয়না কুড়াইয়া পাইল। তখন এদেশে আয়নার চলন হয় নাই। কাহারও বাড়িতে একখানা আয়না কেহ দেখে নাই। এক কাবুলিওয়ালার ঝুলি হইতে কী করিয়া আয়নাখানা মাঠের মাঝে পড়িয়া গিয়াছিল। আয়নাখানা পাইয়া চাষি হাতে লইল। হঠাৎ তাহার উপরে নজর দিতেই দেখে, আয়নার ভিতর মানুষ! আহা-হা, এযে তাহার বাপজানের চেহারা!

বহুদিন তার বাপ মারা গিয়াছে। আজ বড় হইয়া চাষির নিজের চেহারাই তার বাপের মতো হইয়াছে। সব ছেলেই বড় হইয়া কতকটা বাপের মতো চেহারা পায়। তাই আয়নায় তাহার নিজের চেহারা দেখিয়াই চাষি ভাবিল, সে তাহার বাবাকে দেখিতেছে। তখন আয়নাখানাকে কপালে তুলিয়া সে সালাম করিল। মুখে লইয়া চুমো দিল। "আহা বাপজান! তুমি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া আমার ধানক্ষেতের মধ্যে লুকাইয়া আছ! বাজান–বাজান! ও বাজান!"

চাষি এ ভাবে কথা কয় আর আয়নার দিকে চায়। আয়নার ভিতরে তাহার বাপজান কতই ভঙ্গি করিয়া চায়।

চাষি বলে, “বাজান! তুমি তো মরিয়া গেলে। তোমার ক্ষেত ভরিয়া আমি সোনাদিঘা ধান বুনিয়াছি, শাইল ধান বুনিয়াছি। দেখ-দেখ বাজান! কেমন তারা রোদে ঝলমল করিতেছে। তোমার মরার পর বাড়িতে মাত্র একখানা ঘর ছিল। আমি তিনখানা ঘর তৈরি করিয়াছি। বাজান! আমার সোনার বাজান! আমার মানিক বাজান!”

সেদিন চাষি আর কোনো কাজই করিল না। আয়নাখানা হাতে লইয়া তার সবগুলি ক্ষেতে ঘুরিয়া বেড়াইল। সাঁঝ হইলে বাড়ি আসিয়া আয়নাখানাকে কোথায় রাখে। সে গরিব মানুষ। তাহার বাড়িতে তো কোনো বাক্স নাই! সে পানির কলসির ভিতর আয়নাখানাকে লুকাইয়া রাখিল।

পরদিন চাষি এ কাজ করে, ও কাজ করে, দৌড়াইয়া বাড়ি আসে। এখানে যায়, সেখানে যায়, আর দৌড়াইয়া বাড়ি আসে। পানির কলসির ভিতর হইতে সেই আয়নাখানা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, আর কত রকমের কথা বলে! “বাজান! আমার বাজান! তোমাকে একলা রাখিয়া আমি এ-কাজে যাই ও-কাজে যাই, তুমি রাগ করিও না। দেখ বাজান! যদি আমি ভালোমতো কাজকাম না করি তবে আমরা খাইব কী?”

চাষির বউ ভাবে, “দেখরে। এতদিন আমার সোয়ামি আমার সাথে কত কথা বলিত, কত-হাসি-তামাশা করিয়া এটা-ওটা চাহিত, কিন্তু আজ কয়দিন আমার সাথে একটাও কথা বলে না। পানির কলসি হইতে কী যেন বাহির করিয়া দেখে, আর আবোল-তাবোল বকে, ইহার কারণ কী?”

সেদিন চাষি ক্ষেত-খামারের কাজে মাঠে গিয়াছে। চাষির বউ গোপনে-গোপনে পানির কলসি হইতে সেই আয়নাখানা বাহির করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিল। আয়নার উপর তার নিজেরই ছায়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে তো কোনোদিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নাই। সে মনে করিল, তার সোয়ামি আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়া এই পানির কলসির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য আজ কয়দিন তার স্বামী তার সাথে কোনো কথা বলিতেছে না। যখনই অবসর পায় ওই মেয়েছেলের সাথে কথা বলে।

“আসুক আগে মিনসে বাড়ি। আজ দেখাইব এর মজা!” একটি ঝাঁটা হাতে লইয়া বউ রাগে ফুলিতে লাগিল; আর যে-যে কড়া কথা সোয়ামিকে শুনাইবে, মনে-মনে আওড়াইয়া তাহাতে শান দিতে লাগিল।

দুপুরবেলা মাঠের কাজে হয়রান হইয়া, রোদে ঘামিয়া, চাষি যখন ঘরে ফিরিল, চাষির বউ ঝাঁটা হাতে লইয়া তাড়িয়া আসিল; “ওরে গোলাম, তোর এই কাজ? একটা কা'কে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিস?” এই বলিয়া আয়নাখানা চাষির সামনে ছুড়িয়া মারিল।

“কর কী? ও যে আমার বাজান!” অতি আদরের সাথে সে আয়নাখানা কুড়াইয়া লইল।

“দেখাই আগে তোর বাজান!” এই বলিয়া ঝটকা দিয়া আয়নাখানা টানিয়া লইয়া বলিল, “দেখ তো মিনসে! এর ভিতর কোন মেয়েলোক বসিয়া আছে? এ তোর নতুন বউ কিনা?”

চাষি বলে, “তুমি কি পাগল হইলে? এ যে আমার বাজান!”

“ওরে গোলাম! ওরে নফর! তবু বলিস তোর বাজান! তোর বাজানের কি গলায় হাসলি, নাকে নথ আর কপালে টিপ আছে নাকি?” বউ আরও জোরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

ও বাড়ির বড়বউ বেড়াইতে আসিয়াছিল। মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়া বলিল, "কিলো, তোদের বাড়ি এত ঝগড়া কিসের? তোদের ত কত মিল। একদিনও কোনো কথা কাটাকাটি শুনি নাই।"

চাষির বউ আগাইয়া আসিয়া বলিল—"দেখ বুবুজান! আমাদের মিনসে আর একটি বউ বিবাহ করিয়া আনিয়া পানির কলসির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ওই সতিনের মেয়ে সতিনকে আমি পা দিয়া পিষিয়া ফেলিব না? দেখ-দেখ, বুবুজান! এই আয়নার ভিতর কে?"

ও বাড়ির বড়বউ আসিয়া সেই আয়নার উপরে মুখ দিল! তখন দেখা গেল আয়নার ভিতরে দুইজনের মুখ। ও বাড়ির বড়বউ বলিল, "এ তো তোর চেহারা। আর একজন কার চেহারাও যেন দেখিতে পাইতেছি।"

চাষি বলিল, "কী বলেন বুবুজান, এর ভিতর আমার বাপজানের চেহারা।"

এই বলিয়া চাষি আসিয়া আয়নার উপরে মুখ দিল। তখন তিনজনের চেহারাই দেখা গেল। তাহাদের কলরব শুনিয়া ও বাড়ির ছোট-বউ, সে বাড়ির মেজো-বউ আসিল, আরফানের মা, রহমানের বোন, আনোয়ারার নানী আসিল। যে আয়নার উপরে মুখ দেয়, তাহারি চেহারা আয়নায় দেখা যায়—এ তো বড় তেলেছমাতির কথা!

শোন, শোন, এই কথা এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে রটিয়া গেল। এ-দেশ হইতে ও দেশ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল সেই জাদুর তেলেছমাতি দেখিতে। তারপর ধীরে-ধীরে লোকে বুঝিতে পারিল, সেটা আয়না।

লেখক-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তাঁকে বলা হয় পল্লিকবি। তিনি অনেক গদ্যও রচনা করেছেন। তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। শিশুদের জন্য লেখা 'ডালিমকুমার' তাঁর অনবদ্য রচনা। এ ছাড়াও তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশী' ইত্যাদি কবিতাগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

এক চাষি একদিন ধানক্ষেতে একটি আয়না পেল। তখনও এদেশে আয়নার চল হয় নি। এক কাবুলিওয়ালার ঝুড়ি হতে আয়নাটি পড়ে গিয়েছিল। চাষি হাতে নিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই নিজের ছবি দেখে মনে করল ইনি তার মৃত পিতা। সে আয়নাটি যত্নসহকারে পানির কলসির ভিতর লুকিয়ে রাখল। মাঠ থেকে প্রায়ই এসে সে আয়নাটি দেখত আর ছবির সাথে কথা বলত। এসব কাণ্ড দেখে তার স্ত্রী একদিন কলসির ভিতর কী আছে দেখতে গেল। সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মনে করল, তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে এনে কলসির ভিতর বউকে লুকিয়ে রেখেছে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম ঝগড়া শুরু হয়। পাড়া-প্রতিবেশীরাও এগিয়ে আসে। সকলেই আয়নার দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন চেহারা দেখতে পায়। নিজের চেহারা কেউই বুঝতে পারছে না। কিন্তু অপরের চেহারা বুঝতে পারছে। এদেশ-ওদেশ হতে লোক জাদুর তেলেছমাতি দেখতে ছুটে আসে। তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, এটি আয়না।

শব্দার্থ

আয়না – দর্পণ, আরশি। **কাবুলিওয়ালা** – কাবুল বা আফগানিস্তানের লোক। **ঝুলি**–কাপড়ের তৈরি থলে। **নজর** –দৃষ্টি, লক্ষ। **ক্ষেত** – চাষের জমি। **সাঁঝ** – সন্ধ্যা। **বাক্স** – তোরঙ্গা, পেটিকা। **কলসি** – ঘড়া, পানি রাখার পাত্রবিশেষ। **সোয়ামি** – স্বামী, পতি। **ঝাঁটা** – ঝাড়ু, যা দিয়ে ঝাঁট দেওয়া হয়। **কলরব**–কলরোল। **চেহারা**– মুখচ্ছবি। **রটা**–প্রচার, রাষ্ট্র হওয়া। **তেলেছমাতি** – জাদু সম্বন্ধীয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চাষি আয়নাটি কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিল?

ক. ধানক্ষেতে খ. পাটক্ষেতে
গ. গমক্ষেতে ঘ. মুলাক্ষেতে

২. 'আসুক আগে মিনসে বাড়ি। আজ দেখাইব মজা'। চাষিবউয়ের এরূপ ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ চাষি -

i. অপরিচিত লোক ঘরে নিয়ে এসেছে
ii. রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস ঘরে নিয়ে এসেছে
iii. সংসারে গোপনে তার সতিন এনেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গনি মিয়া রাস্তায় একটা আকর্ষণীয় চকচকে পাথর কুড়িয়ে পায়। সে পাথরটিকে তার ঘরে টিনের বাক্সে লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝেই সে বাক্সটা খুলে পাথরটি দেখে। বারবার বাক্স খুলতে দেখে তার স্ত্রী তাকে সন্দেহ করে।

৩. গনি মিয়া 'আয়না' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. চাষি খ. চাষিবউ
গ. বুবুজান ঘ. ছোটবউ

৪. কোন দিক থেকে এই প্রতিনিধিত্বটা বিবেচনার যোগ্য?

i. গোপনীয়তা রক্ষা
ii. স্ত্রীর সন্দেহ
iii. স্ত্রীকে রাগানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

এক বনে এক অত্যাচারী সিংহ ছিল। বনের এক খরগোশ ঠিক করল সিংহকে সে উচিত শিক্ষা দেবে। খরগোশ সিংহকে একটি কূপ দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘এই কূপে আর একটি সিংহ আছে, সে দাবি করছে, সে এই বনের রাজা।’ এ কথা শুনে সিংহ রেগে আগুন! উঁকি দিয়ে সে কূপের পরিষ্কার পানিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে তর্জন-গর্জন শুরু করল। কূপের সিংহের প্রতিচ্ছবিও ঠিক একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখাল। শেষ পর্যন্ত সিংহ ক্ষেপে গিয়ে কূপের গভীর পানিতে ঝাঁপ দিল।

ক. আয়নাটি চাষি কোথায় লুকিয়ে রাখল?

খ. ‘আসুক আগে মিনসে বাড়ি, আজ দেখাবই এর মজা’– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের সিংহ ‘আয়না’ গল্পে চাষি বউয়ের সাথে কোনদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আয়না’ গল্পের মূলভাব একই কিন্তু পরিণতি ভিন্ন”– এ বিষয়ে তোমার মত দাও।

জাদুকর

হুমায়ূন আহমেদ

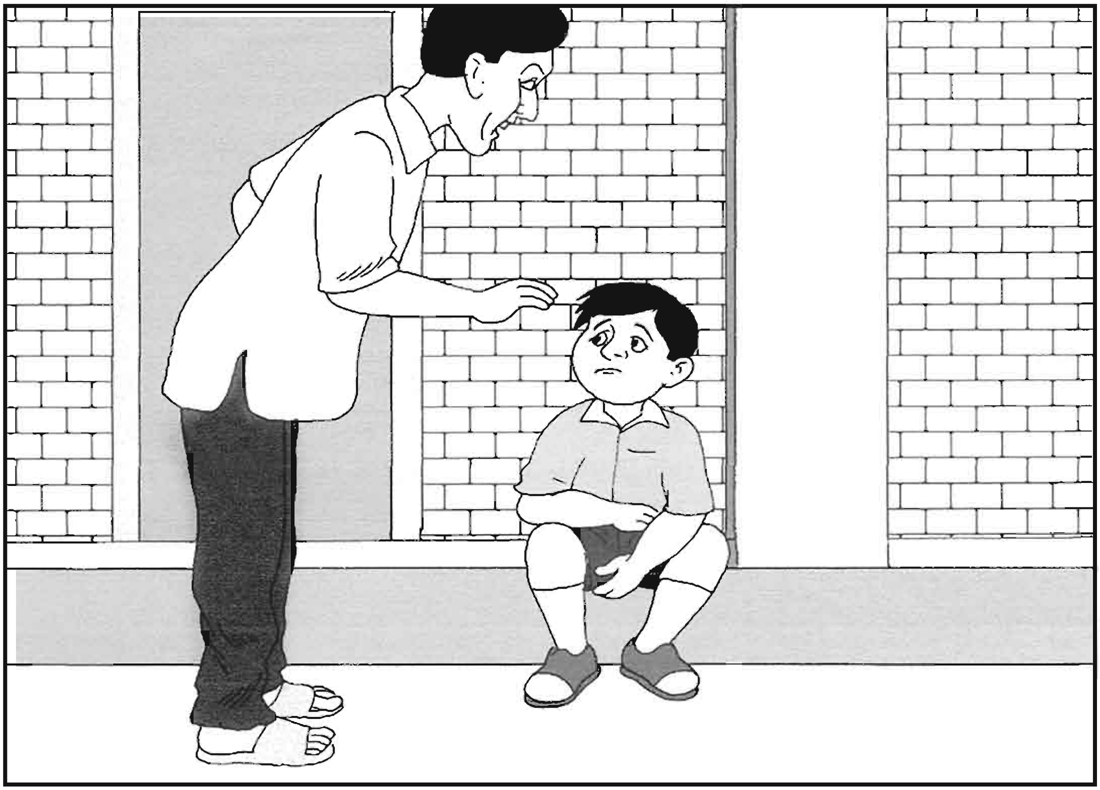

আজ হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার অঙ্ক খাতা দিয়েছে।

বাবলু পেয়েছে সাড়ে আট। শুধু তাই নয়, খাতার উপর লাল পেনসিল দিয়ে ধীরেন স্যার বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন : 'গরু'।

কী সর্বনাশ!

বাবলু খাতা উল্টে রাখল, যাতে 'গরু' লেখাটা কারো চোখে না পড়ে। কিন্তু ধীরেন স্যার মেঘ-স্বরে বললেন : এই বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়া।

বাবলু বেঞ্চির উপরে উঠে দাঁড়াল।

তোর অঙ্ক-খাতায় কী লিখে দিয়েছি সবাইকে দেখা।

সে মুখ কালো করে সবাইকে দেখাল খাতাটা। ফার্স্ট বেঞ্চে বসা কয়েকজন ভ্যাক ভ্যাক করে হেসে ফেলল। ধীরেন স্যার গর্জন করে উঠলেন : এ্যাঁই কে হাসে? মুখ সেলাই করে দেব।

হাসি বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ধীরেন স্যারকে সবাই যমের মতো ভয় করে। আড়ালে ডাকে 'যম স্যার'। ফার্স্ট বেঞ্চেও একটু খিকখিক শব্দ হলো। ধীরেন স্যার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : আরেকবার হাসির শব্দ শুনলে চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব। নাট্যশালা নাকি? এ্যাঁ?

ক্লাস পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। ধীরেন স্যার থমথমে গলায় বললেন : এ্যাঁই বাবলু, তুই ঘণ্টা না-পড়া পর্যন্ত বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকবি।

বাবলু উদাস-চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।বেঞ্চির উপর এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা তেমন কিছু না। কিন্তু বাসায় ফিরে বাবাকে কী বলবে, এই ভয়েই বাবলুর গায়ে ক্ষণে-ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। বাবা মোটেই সহজ পাত্র নন। ধীরেন স্যারের মতো মাস্টারও তাঁর কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাড়িতে আজ ভূমিকম্প হয়ে যাবে বলাই বাহুল্য। বাবলু এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও কুলকুল করে ঘামতে লাগল।

বাবলু ভেবে পেল না অঙ্কের মতো ভয়াবহ জিনিস কী করে পড়াশোনার মধ্যে ঢুকে গেল। কী হয় অঙ্ক শিখে? তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠবার দরকারটা কী? আচ্ছা ঠিক আছে, উঠছে উঠে পড়ুক, কিন্তু প্রথম মিনিটে উঠে দ্বিতীয় মিনিটে আবার পিছলে পড়বার প্রয়োজনটি কী? বাবলু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

স্কুল ছুটি হলো পাঁচটায়।বাবলু বাড়ি না গিয়ে স্কুলের বারান্দায় মুখ কালো করে বসে রইল। স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বলল : বাড়িতে যাও ছোড ভাই।

বাবলু বলল, আমি আজকে এইখানেই থাকব।

কও কী ভাই। বিষয় কী?

বিষয় কিছু না। তুমি ভাগো।

আনিস মিয়া একগাল হেসে বলল, পরীক্ষায় ফেইল করছ কেমুন? বাড়ি থাইক্যা নিতে না আসলে যাইতা না। ঠিক না?

আনিস মিয়া দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বাবলু স্কুল থেকে ছুটে বাইরে চলে আসল; সরকার-বাড়ির জামগাছের নিচে বসে রইল একা-একা।

জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। বাবলুকে ভয় দেখানোর জন্যেই হয়তো অসংখ্য ঝিঁঝিঁ একসঙ্গে ডাকতে লাগল। বিলের দিক থেকে শব্দ আসতে লাগল : 'হতাহতা'। ডানপাশের ঝোপ কেমন নড়ে উঠল। বাবলু শার্টের লম্বা হাতায় ঘন ঘন ঘাম মুছতে লাগল।

এই ছেলে কাঁদছ কেন?

অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না।বাবলুর মনে হলো লম্বামতো একজন লোক ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে ভারী একটা ব্যাগ-জাতীয় কিছু। পিঠেও এরকম একটা বোঁচকা ফিতা দিয়ে বাঁধা।

২০১৫

এই খোকা কী হয়েছে?
বাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি অঙ্কে সাড়ে আট পেয়েছি।

তাই নাকি?
জি। আর ধীরেন স্যার খাতার উপর লিখেছেন : গরু।

বাবলু খাতাটা বের করে লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লোকটি এগিয়ে এসে খাতাটি নিল। সে বেশ লম্বা। এই অন্ধকারেও প্রকাণ্ড বড় একটা চশমা পরা থাকায় প্রায় সমস্তটা মুখ ঢাকা পড়ে আছে। লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, খাতার উপর ‘গরু’ লেখাটা অন্যায় হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উপর সরাসরি কটাক্ষ করা হয়েছে। তার উপর এত বড় বড় করে লেখার প্রয়োজনই-বা কী? ছোট করে লিখলেই হতো।

বাবলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।
উঁহুঁ কাঁদবে না। কাঁদার সময় নয়। কী করা যায় তাই নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।
বাবলু ধরা-গলায় বলল, আমি স্কুলেও যাব না। বাসায়ও ফিরে যাব না। বাকি জীবনটা জামগাছের নিচে বসে কাটাব। না, জাহাজের খালাসি হয়ে বিলাত যাব।
বুদ্ধিটা মন্দ না। কিন্তু চট করে কিছু-একটা করা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তোমার নাম তো জানা হলো না।

আমার নাম বাবলু। ক্লাস সেভেনে পড়ি। আপনি কে?
ইয়ে আমার নাম হলো গিয়ে হইয়েৎসুন।

কী বললেন?

আমার নামটা একটু অদ্ভুত, আমি বিদেশি কি না।
কী করেন আপনি?
আমি একজন পর্যটক। আমি ঘুরে বেড়াই।
বাবলু কৌতূহলী হয়ে বলল, আপনার দেশ কোথায়?
আসো তোমাকে দেখাচ্ছি।

হইয়েৎসুন আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল : ঐ যে দেখছ ছায়া, ওইটা হচ্ছে ছায়াপথ। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। স্প্রিঙের মতো। এর মাঝামাঝি একটি সৌরমণ্ডল আছে। আমরা তাকে বলি ‘নয়ূঁততিনি’। তার ন’নম্বর গ্রহটিতে আমি থাকতাম।

বাবলু একটু সরে বসল। পাগল নাকি লোকটা! কথা বলছে দিব্যি ভালোমানুষের মতো।
বুঝলে বাবলু, বলতে গেলে আমরা বেশ কাছাকাছি থাকি। পৃথিবীও কিন্তু মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে পড়েছে। হা হা হা।

২০১৫

আপনারাও বুঝি বাংলায় কথা বলেন?

উঁহুঁ। তোমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি কারণ আমার সঙ্গে একটি অনুবাদক যন্ত্র আছে।

সে ইশারা করে গোলাকৃতি একটি বাক্স দেখাল। তার কাঁধের কাছে ঝুলছে। মশার আওয়াজের পিনপিন একটি শব্দ আসছে সেখান থেকে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং সে-ভাষায় কথা বলা যায়। প্রাণীদের মস্তিষ্কের নিউরনে বিভিন্ন ধ্বনির যে লাইব্রেরি আছে এবং শব্দবিন্যাসের যে সমস্ত ধারা তা এই যন্ত্রটি ধরতে পারে।

বাবলুর একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। লোকটি বলল, এই যে চারদিকে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে এরা কী বলছে তা তুমি বুঝতে পারবে যদি যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিই। দেব?

বাবলু ভয়ে-ভয়ে বলল, দিন। কিন্তু ব্যথা লাগবে না তো?

উঁহুঁ। মাথা খানিকটা ভোঁ ভোঁ করবে হয়তো। দিয়েই দেখ।

হুইয়েৎসুন যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধের উপর বসিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, ঝিঁঝিঁপোকাগুলো কথা বলছে।

পোকা চাই। খাবার জন্যে পোকা চাই। এই লোকদুটি যাচ্ছে না কেন। কী করছে, কী করছে?

এরা দুজন কী করছে? পোকা চাই। পোকা চাই। পোকা চাই।

বাবলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকটি বলল, মানুষ যেভাবে কথা বলে এরা কিন্তু সেভাবে কথা বলে না। ডানার সঙ্গে ঘষে শব্দ করে। ভাবের আদান-প্রদানের কত অদ্ভুত ব্যবস্থাই-না প্রাণিজগতে আছে!

বাবলু তার কথায় কান দিচ্ছিল না। কারণ, সে পরিষ্কার শুনতে পেল জামগাছের একটি পাখির বাসা থেকে ফিসফিস করে কথাবার্তা হচ্ছে। আহ, এই লোকদুটি কী বকবক শুরু করেছে, ঘুমুতে দেবে না নাকি?

ঠিক বলেছ। মানুষের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এগুলো মহাবোকা।

বলতে বলতে পাখিগুলো খিকখিক করে হাসতে লাগল। লোকটি বলল, বাবলু যন্ত্রটা এবার খুলে ফেলা যাক। তোমার অভ্যাস নেই তো, মাথা ধরে যাবে।

বাবলু বলল, আমি যদি ওদের সঙ্গে কথা বলি ওরা আমার কথা বুঝতে পারবে?

দু-একটা কথা বুঝতে পারে। তবে বেশিরভাগই বুঝতে পারে না। ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। অবশ্য সবার না। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, যেমন ধরো তিমি মাছ।

তিমি মাছ বুদ্ধিমান?

অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুধু হাত নেই বলে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে না। ডলফিনও খুব বুদ্ধিমান। ওদের যদি হাত থাকত তাহলে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত।

ওদের হাত নেই কেন?

প্রকৃতির খেয়াল। প্রকৃতির খেয়ালিপনার জন্যে তিমি এবং ডলফিনের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদেরও পশুর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

হইয়েৎসুন একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধ থেকে নিয়ে এলো।
এবার তোমার ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। কী ঠিক করলে? জাহাজের খালাসি হবে?
না।
তবে কী? অন্ধকার জামগাছের নিচে বসে থাকবে?
উঁহুঁ আমি আপনার সঙ্গে যাব।
তাই বুঝি?
জি।
কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের চলাফেরার জন্য রকেট বা স্পেসশিপ নেই। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই সরাসরি বস্তু স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ায়। তোমাকে দিয়ে তা হবে না। তা ছাড়া আমি এখন যাব তোমাদের বৃহস্পতি গ্রহের একটি চাঁদে। তার নাম হচ্ছে টিটান। সেখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।
আমিও আপনার সঙ্গে টিটানে যাব।
একেবারেই অসম্ভব। সে জায়গাটা বিষাক্ত ফ্লোরিন গ্যাসে ভরপুর। তার উপর আছে সালফার-ডাই-অক্সাইড। আমার তাতে কিছু হবে না। কিন্তু তুমি মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।
বাবলু মুখ কালো করে চুপ করে রইল। লোকটা শান্তস্বরে বলল, তুমি বরং ভালোমতো পড়াশোনা শুরু কর। কারণ, তোমাদের এখনো অনেক কিছুই শেখার আছে। অঙ্কে সাড়ে আট পেলে হবে না।
বাবলু কোনো উত্তর দিল না। লোকটি বলল, মানুষের মস্তিষ্ক প্রথম শ্রেণির। ইচ্ছে করলেই এরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।
বাবলু মুখ কালো করে বলল, আমি অঙ্কটঙ্ক কিছু শিখতে চাই না। হইয়েৎসুন হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, মানুষেরা প্রাণী হিসেবে কিন্তু খুব অদ্ভুত। এরা প্রায় সময়ই যা ভাবে তা বলে না। মুখে এক কথা বলে কিন্তু মনের কথা ভিন্ন। তুমি মনে মনে ভাবছ এখন থেকে খুব মন দিয়ে অঙ্ক শিখবে যাতে এ ধরনের যন্ত্র বানাতে পারো, কিন্তু মুখে অন্য কথা। ঠিক না?
বাবলু থেমে বলল, আপনি কী করে বুঝলেন?
আমার কাছে ছোটখাটো একটা কমুনিকেটর যন্ত্র আছে। এ দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীরা কী ভাবছে তা অনেক দূর থেকে টের পাওয়া যায়। যেমন ধরো যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার বাবা এবং তোমার ধীরেন স্যার এই মুহূর্তে কী ভাবছেন। তাঁরা দুজনই হারিকেন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তোমাদের স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বাসায় গিয়ে খবরটা দেবার পর থেকেই তোমার বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। তোমার বাবার মনের অবস্থাটা বুঝতে চাও?
বাবলু মাথা নাড়ল। সে বুঝতে চায়। লোকটা যন্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, বাবা মনে-মনে বলছেন, আমার পাগলা ছেলেটা কোন অন্ধকারে একা-একা বসে আছে কে জানে। আট পেয়েছ তো কী হয়েছে। আহা বেচারা! আমার ভয়ে বাড়িও আসতে পারছে না। নাহ্ আর কোনোদিন রাগারাগি করব না। ভাবতে ভাবতে বাবা চোখ মুছলেন।
ধীরেন স্যারও ঠিক একই রকম কথা ভাবছেন– আহারে বাচ্চা ছেলেটা কোথা-না-কোথায় বসে আছে অন্ধকারে। খাতায় লেখাটা অন্যায় হয়েছে খুব। সেই লজ্জাতেই বাড়ি যাচ্ছে না। নাহ্ ছাত্রদের সঙ্গে আরেকটু ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। নাহ্ আর এইরকম রাগারাগি করব না। বাবলুটাকে রোজ এক ঘণ্টা করে অঙ্ক শেখাব।
হইয়েৎসুন হাসতে-হাসতে বলল : কি শুনলে তাদের মনের কথা?

হুঁ।

জাহাজের খালাসি হবার পরিকল্পনা এখনও আছে?

জি না।

ভালো। খুব ভালো। তা বাবলু সাহেব, আমার তো এখন যেতে হয়।

আরেকটু বসুন।

না আর বসা যাচ্ছে না। তোমার বাবা আর স্যার এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখলে ব্যাপারটি ভালো হবে না। যাই তাহলে, কেমন।

তার কথা শেষ হবার আগেই বাবাকে এবং ধীরেন স্যারকে দেখা গেল। দপ্তরি আনিস মিয়া একটি হারিকেন হাতে আগে-আগে আসছে। বাবলু ভিনগ্রহের লোকটিকে আর দেখতে পেল না।

বাবা এসেই প্রচণ্ড একটি চড় বসালেন। রাগী গলায় বললেন, এই বয়সে বাঁদরামি শিখেছিস। বাড়ি না গিয়ে গাছের নিচে বসে ধ্যান করা হচ্ছে। তোর পিঠের ছাল তুলব আজকে।

ধীরেন স্যার থমথম স্বরে বললেন, খারাপ পরীক্ষা হয়েছে, কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসবি, তা না সাপ-খোপের আড্ডার মধ্যে এসে বসা। আগামীকাল তুই সারা পিরিয়ড আমার ক্লাসে নীলডাউন হয়ে থাকবি। গরু কি আর সাধে লিখেছি?

বাবলু এদের কথায় একটুও রাগ করল না। কারণ, এখন সে নিশ্চিত জানে এসব তাদের মনের কথা নয়। তাছাড়া সে হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখল বাবার চোখ ভেজা। বাবা কাঁদতে-কাঁদতে তাকে খুঁজছিলেন।

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। লেখালেখি করা তাঁর নেশা, একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে তিনি খ্যাত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'— লেখকশিবির পুরস্কারে সম্মানিত গ্রন্থ। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি পুরস্কার এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক। বিভিন্ন ছায়াছবিও নির্মাণ করেছেন তিনি। তাঁর নির্মিত 'আগুনের পরশমণি' ১৯৯৫ সালে শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। ১৯শে জুলাই ২০১২ তারিখে এই নন্দিত কথাসাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

বাবলু হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে সাড়ে আট পেয়েছে। অঙ্কের স্যার তার খাতার উপর বড় করে লাল পেনসিল দিয়ে 'গরু' লিখে দিয়েছেন এবং ক্লাসেও অপমান করেছেন। বাবলুর বাবাও সহজ পাত্র নন। তাই ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে বাবলু ছুটির পর বাড়িতে না ফিরে একটি নির্জন স্থানে গাছের নিচে বসে রইল। রাতের অন্ধকারে তার সামনে ভিনগ্রহের এক পর্যটক এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে একটি কমুনিকেটর যন্ত্র আছে। বুদ্ধিমান প্রাণীরা কী ভাবছে এ যন্ত্র দিয়ে দূর থেকে টের পাওয়া যায়। যন্ত্রটির মাধ্যমে বাবলু জানতে পারল তার বাবা ও অঙ্কের স্যার দুজনই তার জন্য খুব চিন্তিত এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্য দুঃখবোধ করছেন। এরই মধ্যে স্যার ও বাবা বাবলুকে খুঁজতে খুঁজতে তার সামনে এসে গেলেন। বাবলু ভিনগ্রহের ব্যক্তিটিকে আর দেখতে পেল না। বাবা এবং স্যার দুজনই বাবলুকে দেখে খুব বকাবকি করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে বাবলুর একটুও রাগ হলো না। কারণ ইতোমধ্যে সে তাঁদের মনের কথা জেনে ফেলেছে। তাঁরা মুখে যা বলছেন তা মোটেই তাঁদের মনের কথা নয়। গুরুজনরা অনেক সময়ই ছোটদের বকাবকি করেন। সেটা তাদের ভালোর জন্যই করেন। প্রকৃতপক্ষে সব বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে এবং শিক্ষক তাঁদের ছাত্রকে ভালোবাসেন।

শব্দার্থ

নাট্যশালা – নাটক, অভিনয়, নৃত্যগীতবাদ্য করার স্থান বা ঘর। **দুগ্ধপোষ্য শিশু** – যে শিশুকে শুধুই দুধ খাইয়ে পালন করতে হয়। **বাহুল্য** – অতিরিক্ত, বহুলতা, আধিক্য। **মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি** – ছায়াপথ, আকাশ গঙ্গা। **সৌরমণ্ডল** – সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহসমূহ। **নিউরন** – স্নায়ুর এক ধরনের কোষ। **রকেট বা স্পেসশিপ** – মহাশূন্যযান, মহাকাশযান। **কমুনিকেটর যন্ত্র** – যোগাযোগ যন্ত্র। **ধ্যান** – গভীর চিন্তা। **নীল ডাউন** – হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পরীক্ষায় বাবুল অঙ্কে ফের করেছে?

ক. বার্ষিক খ. প্রথম সাময়িক
গ. ২য় সাময়িক ঘ. ষান্মাসিক

২. ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে বাবুল ঘামতে লাগল। কারণ -

ক. তার বাবা তাকে আরও কঠিন শাস্তি দিবেন
খ. তার মা তাকে আরও কঠিন শাস্তি দিবেন
গ. তার শ্রেণি শিক্ষক তাকে আরও কঠিন শাস্তি দিবেন
ঘ. ঘন্টা না পড়া পর্যন্ত তাকে নীল ডাউন হয়ে থাকতে হবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন খেলতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে ফেলল। বাড়ি ফিরলে তার মা তাকে অনেক বকাঝকা করল। সুমন এতে অনেক কষ্ট পেল। কিন্তু পরে সে দেখল তার মা তার ছেঁড়া জামাটা যত্নসহকারে সেলাই করছে।

৩. জাদুকর গল্পের কোন দুজনের কর্মের সাথে সুমনের মায়ের কর্মের মিল রয়েছে?

ক. ধীরেন স্যার ও বাবা
খ. বাবা ও আনিস
গ. হইয়েৎসুন ও বাবা
ঘ. হইয়েৎসুন ও আনিস

৪. যে কারণে এই তুলনা যৌক্তিক -

ক. অমুক্ত বাৎসল্য প্রীতি
খ. শাসন করার প্রবণতা
গ. মাতৃত্ব বোধ
ঘ. পিতৃত্ব বোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক্লাস চলছে। অজয় শেষ বেঞ্চে বসে কী সব আঁকছে! শিক্ষক বিষয়টি লক্ষ করলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে অজয়ের আঁকা ছবিটি দেখলেন। খুব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। শিক্ষক ছবির প্রশংসা করে বললেন, "প্রতিটি ক্লাসই তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আঁকার কাজটি তুমি ড্রইং ক্লাসে বা অবসর সময়ে করতে পার।" অজয় বিষয়টি বুঝতে পারল।

ক. "বুদ্ধিবৃত্তির উপর সরাসরি কটাক্ষ করা হয়েছে"–উক্তিটি কার?

খ. ধীরেন স্যার ও বাবার বকা খেয়েও বাবলু কেন রাগ করল না?

গ. উদ্দীপকের শিক্ষক 'জাদুকর' গল্পের ধীরেন স্যারের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে "জাদুকর গল্পের আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।" – উক্তিটি যাচাই কর।

ঋণ পরিশোধ

মোহাম্মদ নাসির আলী

তখন বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল। দিল্লিতে তাঁর রাজধানী। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ, বাদশাহ আকবর খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, রাজ্য চালাবার দক্ষতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। যদিও নিজে তেমন বিদ্বান ছিলেন না, তবুও বিদ্বান ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট কদর করতেন তিনি। গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকদের জাতি-ধর্ম বিচার না করে নিজের দরবারে এনে তিনি পরম সমাদরে ঠাঁই দিতেন। আবুল ফজল, মোল্লা দোপিঁয়াজা, রাজা মানসিংহ, খান খানান, কবি গঙ্গা, ফৈজী, তানসেন, বীরবল ও তোডরমল– এই নয় জন বিশেষ জ্ঞানীলোক ছিলেন তাঁর দরবারে। তাঁদের ভিতর গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, রাজনীতিবিদ, হাস্যরসিক, ইতিহাসবিদ–সবাই ছিলেন। এক-এক বিষয়ে এক-একজন ছিলেন যেন একটি অমূল্য রত্ন। তাই তাঁদের নয়জনের দলটিকে বলা হতো 'নবরত্ন'।

বাদশাহ্ আকবরের এ-নবরত্নের একজন ছিলেন এক গরিব ব্রাহ্মণ। তিনি হাস্যরসিক ছিলেন আর খুব গল্প বলে আসর জমাতে পারতেন। তাই যতই দিন যেতে লাগল বাদশাহ্ এ-ব্রাহ্মণের উপর ততই খুশি হয়ে উঠলেন। একদিন তাঁর গল্প শুনে তিনি বললেন : তোমার গল্প শুনে আজ যেমন হেসেছি, তেমন জীবনে কোনোদিন হেসেছি বলে তো মনে পড়ে না। তুমি যা বখশিশ চাইবে, তা-ই দেব তোমাকে। কী চাও তুমি?

ব্রাহ্মণ তখন উঠে বাদশাহ্কে কুর্নিশ করে বললেন : শাহানশাহ্, সত্যিই যদি গরিবের উপর খুশি হয়ে থাকেন, তা হলে আপনার জল্লাদকে হুকুম করুন আমার পিঠে চাবুকের একশ ঘা দিতে। তা-ই হবে আমার মনের মতো বখশিশ।

বাদশাহ্ এ-কথা শুনে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। আমীর-ওমরাহ্ যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁরাও অবাক! কে কবে শুনেছে চাবুকের ঘা চেয়ে নিতে বখশিশের বদলে?

বাদশাহ্ পুনরায় বললেন : কী তুমি চাও ঠিক করে বলো। চাবুকের ঘা কি কখনও বখশিশ হতে পারে? নিশ্চয়ই তুমি হাসি-তামাশা করছ।

ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললেন : হুজুরের সঙ্গে হাসি-তামাশা করব তেমন বেয়াদব আমি নই। হয়তো আমিই প্রথম ব্যক্তি যে জাঁহাপনার কাছে এমন আজব ধরনের বখশিশ চেয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, একান্ত যদি আমাকে বখশিশ দিতে হয় তবে যা চেয়েছি তা-ই দিন। আর তা যদি না দিতে হয়, কিছুই দেবেন না জাঁহাপনা।

বাদশাহ্ কিছুতেই রাজি হন না বেকসুর একটা লোকের পিঠে চাবুক মারার হুকুম দিতে। বখশিশ দিতে চেয়ে সাজা কী করে দেবেন?

দরবারে নানারকম লোকই ছিল। কেউ-কেউ ছিল হিংসুটে। অল্পদিন হলো ব্রাহ্মণ এসেছেন শাহি দরবারে; কিন্তু এরই ভিতর তিনি বাদশাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। ব্রাহ্মণের এ সৌভাগ্যে তারা তাঁকে হিংসা করত। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতো। তাদেরই একজন টিপ্পনী কাটল : হয়তো বামুন ভেবেছে, চাবুকের পিটুনি খেয়ে ওর বুদ্ধি আরও খুলবে।

ব্রাহ্মণ তার দিকে ফিরে বললেন : সত্যিই তা-ই। সেজন্যই ওস্তাদ তাঁর শাগরেদদের বেতের পিটুনি দেন। কোনো-না-কোনো লোক পিটুনি খেয়েই শেখে। রোগ সারাতে পিটুনি যে কেমন ভালো ঔষধ একটু পরেই আপনারা তা দেখতে পাবেন।

বাদশাহ্ দেখলেন উপায়ান্তর নেই। ব্রাহ্মণ নাছোড়বান্দা, কিছুতেই তাঁর কথার নড়চড় হতে দেবেন না। অবশেষে নাচার হয়ে তিনি ব্রাহ্মণের পিঠে চাবুক মারতেই হুকুম দিলেন।

জল্লাদ এসে বেচারা ব্রাহ্মণকে চাবুক মারতে শুরু করল—শপাং শপাং। পঞ্চাশ ঘা মারবার পরে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হাত উঠিয়ে বলে উঠলেন : থামো, থামো, আর নয়।

বাদশাহ্   বললেন : থামাও থামাও, আর মেরো না। এবার বুঝি বামুনের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে!

২০১৫

ব্রাহ্মণ বললেন : শাহানশাহ এবার আমার ঋণ পরিশোধের পালা। আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার বখশিশের অর্ধেক আমি তাকে দেব। আমার সেই বন্ধুটিকে এবার এখানে আনতে অনুমতি দিন। সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে আবার সবাই অবাক হয়ে রইল। বাদশাহ ভাবলেন, একটা রহস্য আছে এর ভিতর। তাই অনুমতি দিতে বিলম্ব হলো না। ব্রাহ্মণ তখন বাইরে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন দেউড়িতে পাহারারত বিশালদেহী এক দারোয়ানকে। এনে বললেন ; এই আমার সেই বন্ধু, শাহানশাহ। আমার বখশিশের অর্ধেক প্রাপ্য এ-বন্ধুটির।

দারোয়ানকে দেখে বাদশাহ আকবর তাজ্জব হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! তাঁর দারোয়ান কী করে এ বিদেশি ব্রাহ্মণের বন্ধু হতে পারে?

ব্রাহ্মণ তখন সব কথা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন : দিল্লি থেকে অনেক দূরে কালপী নামক এক গ্রামে আমার বাস। অত্যন্ত গরিব আমি। বরাবর শাহানশাহর গুণগ্রাহিতার কথা শুনে আসছি। কিন্তু শাহি দরবারে হাজির হবার ভাগ্য বা সুবিধা কখনও হয় নি। একবার তাই ভারি ইচ্ছে হলো দিল্লি আসতে। তারপর সত্যি একদিন পায়ে হেঁটে দিল্লি এসে হাজির হলাম। অনেক দূর হেঁটে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, কিন্তু মনে তবু অপার আনন্দ, এতদিনে মনের বাসনা পূর্ণ হলো। দিল্লি এলাম। একপা-দুপা করে শাহি-মহলের দিকে ভয়ে-ভয়ে এগোচ্ছি। দেউড়ির কাছে আসতেই পথ আগলে দাঁড়াল হুজুরের বিশালবপু এই দারোয়ান।

ধমক দিয়ে বলল : কোথায় যাচ্ছ? আমি চমকে গেলাম। মিনতি করে বললাম : অনেক দূরদেশ থেকে পায়ে হেঁটে এসেছি বাবা, শাহানশাহ আকবরকে একটিবার চোখে দেখতে। আমার এ-কথায় দারোয়ানের মন ভিজল না। সে অনেক টাকা বখশিশ চেয়ে বসল। বখশিশ না পেয়ে কাউকেই নাকি সে দরবারে ঢুকতে দেয় না। এদিকে আমার সঙ্গে নেই একটিও কানাকড়ি। কী বখশিশ দেব দারোয়ানকে? অবশেষে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললাম : ট্যাঁকে যে কিছু নেই তো দেখতেই পাচ্ছ। তবে হ্যাঁ, আশা আছে বাদশাহর দরবারে ঢুকে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে কিছু এনাম নিশ্চয়ই পাব। যা-কিছু আমি পাই তার অর্ধেক তোমাকে দেব বলে ওয়াদা করছি। আমার এ-সঙ্গত প্রস্তাবে হুজুরের দয়ালু দারোয়ান রাজি হলো। রাজি হয়ে আমাকে দরবারে ঢুকতে দিল। সে-অবধি দরবারে যাতায়াত করছি। এতদিন হুজুরের নেকনজর আমার উপর পড়ে নি বলে ঋণ শোধেরও কোনো উপায় হয় নি। এ দারোয়ানের দিন কেটেছে আশায় আশায়। হুজুরের দয়ায় আজ আমার সে ঋণ পরিশোধের সুযোগ এসেছে।

এটুকু বলে ব্রাহ্মণ হতভম্ব দারোয়ানের দিকে চেয়ে বললেন : বাদশাহ খুশি হয়ে আজ আমাকে একশ চাবুকের ঘা বখশিশ দিতে রাজি হয়েছেন। তার অর্ধেক আমি নিয়েছি। এবার বাকি অর্ধেক তোমাকে দেওয়ার পালা।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে উপস্থিত আরও অনেকে দারোয়ানের নামে নালিশ করল। তারাও দারোয়ানকে বখশিশ দিয়েই দরবারে ঢুকেছে। এসব শুনে আকবর গেলেন ভীষণ চটে। তিনি হুকুম দিলেন : ওকে আচ্ছা করে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মেরে রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দাও।

২০১৬

চাবুকের পিটুনি দেওয়ার কথা শুনে যে লোকটা ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা করছিল, এবার তার দিকে ফিরে ব্রাহ্মণ বললেন : চাবুকের ঘা খেয়ে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ে কিনা, দারোয়ানকে দেখে শিখে নিন।

সেদিনই দারোয়ানকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। এ ব্রাহ্মণ লোকটিকে তোমরা বোধহয় বুঝতে পেরেছ। ইনিই বিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল। দরবারের অনেকেই তাঁকে ভালোবাসত। বাদশাহ্ সেদিন থেকে তাঁকে নবরত্নের একজন করে নিলেন। তাঁকে অনেক টাকা বখশিশ দিলেন।

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ নাসির আলী ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক ও পুস্তক প্রকাশক। তাঁর সমস্ত ভাবনা, কল্পনা, সৃষ্টির প্রয়াস ছিল ছোটদের জন্য। তাঁর কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে: 'আলী বাবা', 'আকাশ যারা করলো জয়', 'লেবু মামার সপ্তকাণ্ড', 'শাহী দিনের কাহিনী', 'ইবনে বতুতার সফর নামা', 'তিমির পেটে কয়েক ঘণ্টা', 'ভিন দেশী এক বীরবল'। শিশুসাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭) ও ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

বাদশাহ্ আকবরের রাজদরবারে নয়জন বিশেষ জ্ঞানী লোক ছিলেন।এ দলটিকে বলা হতো 'নবরত্ন'। এক-এক বিষয়ে এক-একজন ছিলেন যেন একটি অমূল্য রত্নবিশেষ। বিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল এ নবরত্নের একজন। তিনি সরস গল্প বলে আসর জমাতে পারতেন এবং এ রসাল গল্পের মাধ্যমে মানুষের ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তেমনি একটি রসাল ঘটনার অবতারণা করে তিনি রাজদরবারে নিজের স্থায় আসন গড়ে নিলেন এবং বাদশাহর দুষ্টু চরিত্রের দারোয়ানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। 'ঋণ পরিশোধ' কাহিনীতে মোহাম্মদ নাসির আলী সুন্দর ও শিক্ষণীয় এ ঘটনাটি তুলে ধরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

নবরত্ন – নয়টি রত্ন। বাদশাহ আকবরের রাজদরবারে নয়জন বিশেষ জ্ঞানী লোক ছিলেন। এই দলটিকে নবরত্ন বলা হতো। **জল্লাদ (আরবি শব্দ)** – ঘাতক, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে বধ করে। **তাজ্জব (আরবি শব্দ)** – বিস্ময়জনক, অদ্ভুত। **আমির (আরবি শব্দ)** – সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান, বড়লোক। **ওমরাহ** (আরবি শব্দ) (আমির-এর বহুবচন) উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (মুসলমান রাজ্যে)। **শাগরেদ (ফারসি শব্দ)** – শিষ্য। **নাছোড়বান্দা** – যে ছাড়বার পাত্র নয়। **রহস্য** – গূঢ় বা গুপ্ত তত্ত্ব, গূঢ় মর্ম। **পরিহাস** – রসিকতা। **দেউড়ি** (দেহলি) – বাড়ির প্রবেশদ্বার, ধনিগৃহের ছাদযুক্ত তোরণ। **বাসনা** – অভিলাষ, কামনা, প্রত্যাশা। **বখশিশ (ফারসি শব্দ)** – পারিতোষিক। **হতভম্ব** – কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কী করতে হবে তা বুঝতে না পারা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাদশাহ আকবর কাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন?

ক. বীরবলকে খ. দারোয়ানকে

গ. হিংসুক ব্রাহ্মণকে ঘ. জল্লাদকে

২. বীরবল দারোয়ানকে অর্ধেক এনাম দিতে রাজি হয়েছিল। কারণ–

i. বীরবল রাজদরবারে ঢুকতে চেয়েছিল

ii. বীরবল দারোয়ানকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল

iii. বীরবল দারোয়ানকে পছন্দ করেছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার ভাঁড় ছিলেন গোপাল। তিনি রসাল গল্প বলে আসর জমাতে পারতেন এবং গল্পের মাধ্যমে মানুষের ভুলত্রুটি তুলে ধরে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধিমত্তার কারণে তিনি রাজার প্রিয় পাত্র ছিলেন।

৩. গোপাল ভাঁড়ের সাথে 'ঋণ পরিশোধ' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. বাদশা আকবর খ. দারোয়ান

গ. বীরবল ঘ. মোল্লা দোপিয়াজা

৪. নিচের কোন কারণে উক্ত দুজনের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. বিচক্ষণতা ও রসিকতা খ. প্রতিশোধপরায়ণতা ও রসিকতা

গ. দায়িত্ববোধ ও রসিকতা ঘ. নৈতিকতা ও রসিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

এক দরিদ্র কৃষক প্রতিদিন দেবতার কাছে প্রার্থনা করত। একদিন দেবতা খুশি হয়ে তার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করল। কৃষকের সুখ দেখে তার প্রতিবেশির হিংসে হলো। সে বলল, "তুমি যদি আমাকে তোমার ধনী হওয়ার রহস্য না বলো তাহলে রাজার কাছে নালিশ করব"। ভয়ে কৃষক সবকিছু খুলে বলল। প্রতিবেশীর প্রার্থনায় দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে সে বলল, "তার অনেক অনেক কিছু চাই।" দেবতা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল, "তুমি যা পাবে তার চেয়ে দুই গুণ পাবে কৃষক।" দুষ্ট প্রতিবেশি বলল, "তাহলে আমার এক চোখ অন্ধ করে দিন।"

ক. বাদশাহ আকবরের রাজধানীর নাম কী ?

খ. ব্রাহ্মণ বাদশাহের কাছ থেকে একশ ঘা চেয়ে নিল কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রতিবেশীর সাথে 'ঋণ পরিশোধ' গল্পের কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? সাদৃশ্যগত দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের প্রতিবেশী ও গল্পের ব্রাহ্মণ চরিত্রটি বিষয়গত দিক থেকে এক হলেও নীতিগত দিক থেকে আলাদা।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

রাখালের বুদ্ধি

ভিনদেশি রূপকথা

এক দেশের মন্ত্রী একটা খুব বড় রকমের অপরাধ করেছিলেন। মন্ত্রী সে দেশের রাজার কাছে অনেক ক্ষমা চাইলেন, বললেন অমন ভুল আর কোনো দিন করবেন না। তখন রাজা বললেন, 'বেশ, তোমাকে ক্ষমা করব, যদি তুমি আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার। তোমাকে তিন মাস সময় দিচ্ছি। প্রথম প্রশ্ন : কত দিনে আমার মৃত্যু হবে, দ্বিতীয় প্রশ্ন : ঠিক কত সময়ে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারব, তৃতীয় প্রশ্ন : যেদিন তুমি এইসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমার কাছে আসবে সেদিন বলতে হবে সেই মুহূর্তে আমি কী ভাবছি, এবং তা যে ভুল তা প্রমাণ করতে হবে।'

প্রশ্ন শুনে মন্ত্রীর যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। দেশ-বিদেশের কত জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু একটা প্রশ্নেরও উত্তর পেলেন না। দিন যায়, দিনের পর মাস। তিন মাস পূর্ণ হতে যখন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তখন এক রাখালের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। রাখাল তো প্রথমে চিনতেই পারে নি তাঁকে, যখন চিনতে পারল, অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, 'এ কী মন্ত্রীমশাই, হায় হায়, আপনার এ কী চেহারা হয়েছে?' মন্ত্রীমশায়ের কাছে তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনল রাখাল। বলল, 'ওঃ এই ব্যাপার? কিছু ভাববেন না মন্ত্রীমশাই, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথামতো কাজ করবেন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিন মাস যেদিন শেষ হলো, মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে রাখাল গেল রাজসভায়- মন্ত্রীমশাই সেজেছেন রাখাল, আর রাখাল সেজেছে মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রীকে দেখে রাজা হেসেই ফেললেন। বললেন, 'বাঃ মন্ত্রী, খাসা চেহারা বানিয়েছ তো! আমার প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ মহারাজ, প্রস্তুত। আপনার প্রথম প্রশ্ন—আপনি ঠিক কতদিন বাঁচবেন।তার উত্তর হলো, আপনি ঠিক ততদিনই বাঁচবেন যতদিন না আপনার শেষ নিশ্বাস পড়ছে, শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কোনোমতেই আপনার মৃত্যু হবে না।'

রাজা বললেন, 'বাঃ মন্ত্রী, সাবাস! ঠিক উত্তর দিয়েছ। বেশ, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'মহারাজ, আপনার প্রশ্ন হচ্ছে, সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে আপনার কত সময় লাগবে। এর উত্তর হলো, যদি আপনি সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের সঙ্গে সমান বেগে চলতে থাকেন তাহলে পরদিন সকালে সূর্য উঠার সময় পৃথিবী ঘুরে আসতে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে।'

এ উত্তরও রাজার পছন্দ হলো। তিনি বললেন, 'বেশ, এবার শেষ প্রশ্ন। বলো এই মুহূর্তে আমি কী ভাবছি, আর যা ভাবছি তা যে মিথ্যা তা প্রমাণ কর।'

উত্তরে মন্ত্রীবেশী রাখাল বলল, 'মহারাজ, আপনি অবাক হয়ে ভাবছেন, আপনার অমন নাদুস-নুদুস মন্ত্রী কেমন করে এমন রোগাপটকা হয়ে গেল।'

রাজা বললেন, 'সত্যিই তো, সে-কথাই তো আমি ভাবছি। বেশ, এবার প্রমাণ কর যা ভাবছি তা ঠিক নয়!'

'এই দেখুন প্রমাণ, মহারাজ।' এই বলে মন্ত্রীবেশী রাখাল এক টানে তার মন্ত্রীর পোশাক খুলে ফেলল।

রাখালের পোশাক পরা মন্ত্রী কাঁচুমাঁচু হয়ে সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন, ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন তিনি। বললেন, 'মহারাজ, দেখুন তো, চিনতে পারেন কি আপনার মন্ত্রীকে? আসলে মন্ত্রী হলাম আমি, যাকে আপনি মন্ত্রী বলে মনে করেছিলেন সে নয়।'

মহারাজ যখন শুনলেন এই রাখালের বুদ্ধিতেই মন্ত্রীর প্রাণরক্ষা হলো তখন তাকে অনেক ধনরত্ন দিলেন, আর মন্ত্রীর সব অপরাধ ক্ষমা করলেন।

সারসংক্ষেপ

এক দেশের এক মন্ত্রী বড় রকমের অপরাধ করেছিলেন। এতে ঐ দেশের রাজা তার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। মন্ত্রী রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন তিনি আর অমন ভুল করবেন না; তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। রাজা মন্ত্রীকে শর্ত দিলেন, তিন মাসের মধ্যে তাঁর তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তিনি মন্ত্রীকে ক্ষমা করে দেবেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করেও মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলেন না। শেষে এক রাখালের সাথে তাঁর দেখা হলো। রাখাল ছদ্মবেশে রাজদরবারে গিয়ে তার বুদ্ধি দিয়ে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিল। রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে ক্ষমা করলেন এবং রাখালকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিলেন।

শব্দার্থ

মন্ত্র – রাজার পরামর্শদাতা। **ক্রুদ্ধ** – রাগান্বিত। **ক্ষমা**– দোষ বা অপরাধ মার্জনা। **মুহূর্ত** – নিমেষ। **জ্ঞানী**–বুদ্ধিমান। **বুদ্ধি**– ধীশক্তি, জানবার বা বুঝবার ক্ষমতা। **গুণী** – গুণবান, অভিজ্ঞ। **রাখাল**– যে গরু চরায়। **খাসা** – উত্তম, গুণবান, পছন্দসই। **ছদ্মবেশ** – আত্মপরিচয় গোপনার্থে পরিধেয় বেশ। **ধনরত্ন**– সম্পদ

২০১৫

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাখাল কার বেশ ধারণ করেছিল?

ক. রাজার খ. মন্ত্রীর
গ. বাদশার ঘ. নরহরির

২. গল্পটির প্রধান চরিত্র কোনটি?

ক. মন্ত্রী গ. রাখাল
খ. রাজা ঘ. গুণীজন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দুর্গম এলাকায় কিছু মানুষ ভ্রমণে গিয়ে খাবারের সন্ধানে একটি দোকানে গিয়ে হাজির হয়। দাঁড়িপাল্লা ভেঙ্গে যাওয়ায় খাবার দিতে পারছিল না দোকানি। একটি মেয়ে একটি পাত্রে বাটখারা রেখে পানিতে ভাসাল। পাত্রটি যে পর্যন্ত ডুবে গেল সেখানে সে দাগকেটে খাবার মেপে দেয়ার ব্যবস্থা করল।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেয়েটির সাথে 'রাখালের বুদ্ধি' গল্পের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়?

ক. রাখাল খ. মন্ত্রীর
গ. রাজার ঘ. কোতোয়াল

৪. উল্লিখিত চরিত্র দুটির মধ্যে কোন বিষয়টি সেতু বন্ধন তৈরি করেছে?

ক. বিশ্বস্ততা খ. বুদ্ধিমত্তা
গ. আন্তরিকতা ঘ. পরোপকারিতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

খলিফা হারুন-অর-রশীদের শাসনকাল। আলী কোজাই নামের এক ব্যক্তি তার বন্ধু নাজিমের কাছে একটি কলসির ভিতর জলপাইয়ের আড়ালে স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রেখে যায়। দুবছর পরে ফিরে এসে মুদ্রাগুলোর পরিবর্তে পেল টাটকা জলপাই। কাজীও বিচারটি করতে পারলেন না। খলিফা এক রাতে রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় লক্ষ করলেন, এক কিশোর কাজী সেজে প্রমাণ করল, দুবছর জলপাই টাটকা থাকতে পারে না। খলিফার আদেশে নাজিম জলপাইয়ের পরিবর্তে আলী কোজাইকে স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিয়েছিল।

ক. কে মন্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করেন?

খ. মন্ত্রীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার কারণটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের নাজিমের সাথে 'রাখালের বুদ্ধি' গল্পের মন্ত্রীর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের কিশোর এবং 'রাখালের বুদ্ধি' গল্পের রাখালের বুদ্ধির জোরেই আলী কোজাই ও মন্ত্রী বেঁচে গিয়েছিল।"– উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মত ব্যক্ত কর।

২০১৫

বালকের সততা

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বড়বাজারে এক তাঁতির একখানা দোকান ছিল। একদিন দোকানে বেচাকেনা করার সময় একটা জরুরি কাজে করিম বখ্‌শ বলে এক ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। করিম বখ্‌শ এক ঘণ্টা দোকানে বসে থাকল, কিন্তু তবুও দোকানদার ফিরে এল না। এদিকে ক্রেতারা জিনিসপত্রের জন্য তাগাদা দিতে লাগল। করিম বখ্‌শের জিনিসপত্রের দাম জানা ছিল, সে কয়েকখানা কাপড় বিক্রি করল। দুঃখের বিষয় সারা দিন চলে গেল তবুও দোকানদার ফিরে এলো না। করিম অগত্যা সেদিন আর বাড়ি ফিরতে পারল না। দোকানদারের অপেক্ষায় সেখানেই রাত্রি যাপন করল।

পরের দিন যথাসময়ে দোকান খুলে করিম মালিকের অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু মালিকের সন্ধান নেই। করিম অগত্যা নিজেই দোকানে বেচাকেনা করতে লাগল।

এভাবে দুদিন, তিনদিন, শেষে এক মাস কেটে গেল। তাঁতি ফিরল না। করিম দোকানের ভার ফেলে যাওয়া অধর্ম মনে করে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ চালাতে লাগল। তাঁতি যাদের কাছে ঋণী ছিল, করিম তাদের সব

টাকা পরিশোধ করল। তাঁতির হয়েই সে নতুন কাপড়ের চালান এনে দোকানের আয় ঠিক রাখল। এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। করিমের আন্তরিক চেষ্টায় দোকানের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছিল। শেষে এক দোকানের পরিবর্তে তিনটি দোকান স্থাপিত হলো। করিম সব দোকান তাঁতির নামে চালাতে লাগলো।

লোকেরা ভাবল, করিম তাঁতির দোকান কিনে নিয়েছে। করিমের সম্মান-প্রতিপত্তি ইত্যবসরে খুব বেড়ে গেল। সে মস্ত সওদাগর হয়ে বিরাট কারবার চালাতে লাগল।

প্রায় সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। একদিন করিম দোকানের গদিতে বসে আছে। একজন বুড়ো লাঠি ভর করে তারই দোকানের সামনে করিম বলে একটা বালকের খোঁজ করছে। বুড়োর পরনে একখানা ময়লা কাপড়, রোগা চেহারা, শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। তাকে পথের ভিক্ষুক বলে মনে হচ্ছিল। করিম দৌঁড়ে এসে বুড়োকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে বলল, "আমি হচ্ছি সেই করিম, এই সাত বছর আমি আপনার দোকান পাহারা দিয়েছি। দয়া করে এখন আপনি আপনার দোকানের ভার নিন, আমি বিদায় হই।"

করিমের মহৎপ্রাণের পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধের দুচোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। বললেন– আমার আর কিছু দরকার নেই, এ সবই তোমার। আমার এ সংসারে যারা আপন ছিল, সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন তুমিই আমার আপন। সেই সাত বছর আগের কথা, এখান থেকে বেরিয়ে পথে সংবাদ পেলাম আমার পত্নীর সাংঘাতিক পীড়া। কালবিলম্ব না করে আমাকে বাড়ি যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম পত্নীর মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে ছেলে দুটো মারা গেল। তারপর নানা দুর্বিপাকে পড়ে আমি কিছুতেই বাড়ি ত্যাগ করতে পারলাম না। তারপর এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কেউ নেই।

আত্মীয়-স্বজন, অর্থ, দেহের বল সব হারিয়ে এখন আমি পথের ফকির হয়েছি। অতি দুঃখে অনেক আশা-নিরাশায় মনে হলো দোকানে গিয়ে একবার করিমের সন্ধান করি, তাকে যদি পাই তার কাছ থেকে দু-এক টাকা ভিক্ষে নেব। দোকান কি আর এতদিন আছে? করিম, আমি তোমাকে এমন রাজার হালে দেখব এ কখনো মনে করিনি। আর তুমি যে এমন করে আমার কাছে পরিচয় দিলে এ ভেবে আমার মনে যে কী আনন্দ হচ্ছে তা আর কী বলব। বলো বাবা, তুমি মানুষ না ফেরেশতা!

করিম সবিনয়ে বলল, আপনি আমার পিতার মতো আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, সে বিশ্বাসকে আমি রক্ষা করতে পেরেছি এই আমার পক্ষে ঢের। এর বেশি আমি কিছু আশা করিনি।

তাঁতি করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ করলেন না। জীবনে তার আর বন্ধন রইল না। একটা মাসিক বন্দোবস্ত করে তিনি অতঃপর তীর্থে চলে গেলেন।

লেখক-পরিচিতি

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেষ করে প্রথম জীবনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে ডাক্তারি (হোমিওপ্যাথি) পেশা গ্রহণ করেন। তিনি অনেক উপদেশমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে– 'উন্নতজীবন', 'মহৎজীবন', 'মানবজীবন', 'ধর্মজীবন', 'প্রীতিউপহার'।

২০২৫

সারসংক্ষেপ

এক তাঁতির একটি কাপড়ের দোকান ছিল। একদিন জরুরি কাজে তিনি দোকানের বাইরে গেলেন, দোকানের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন করিম বখ্‌শ নামের এক ছেলেকে। নানা দুর্বিপাকে পড়ে দোকানি দীর্ঘদিন ফিরে আসতে পারলেন না। করিম সততার সাথে কাজ করে দোকানের অনেক উন্নতি করল। ক্রমে এক দোকানের পরিবর্তে তিনটি দোকান স্থাপিত হলো। প্রায় সাত বছর পরে হঠাৎ দোকানি ফিরে এলেন। করিম সাদরে তাঁকে বরণ করে দোকানের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিতে আগ্রহী হলো। করিমের মহৎ প্রাণের পরিচয় পেয়ে বৃন্ধ দোকানি অভিভূত হলেন। নিজের জন্য একটা মাসিক বন্দোবস্ত করে, করিমের হাতেই দোকান বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তীর্থে চলে গেলেন। বালক তার সততার পুরস্কার পেল।

শব্দার্থ ও টীকা

অগত্যা – বাধ্য হয়ে। **বিশ্বস্ত** – বিশ্বাসের পাত্র, বিশ্বাসযোগ্য। **ইত্যবসরে** – এ সময়ের মধ্যে, ইতোমধ্যে। **বিলম্ব**–দেরি। **দুর্বিপাক** – দুর্যোগ। **অতিবাহিত** – পার করা। **সন্ধান** – খোঁজ। **বন্দোবস্ত** – ব্যবস্থা। **অতঃপর** –তারপর। **প্রতিপত্তি** – প্রতিষ্ঠা, সম্মান। **তীর্থ** – পুণ্যস্থান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃদ্ধ মাসিক বন্দোবস্ত করে কোথায় গেলেন ?

ক. হজে   খ. তীর্থে
গ. কাশিতে   ঘ. মদিনায়

২. 'এর বেশি আমি কিছু আশা করি নি' - উক্তিটিতে করিম চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

i. পরোপকারিতা
ii. বিচক্ষণতা
iii. সততা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একদিন এক কাঠুরিয়া তার একমাত্র কুঠার হারিয়ে কাঁদছিল। ফেরেশতা তার সততা পরীক্ষা করার জন্য সোনা, রূপা ও লোহার তৈরি তিনটি কুঠার দেখালেন। সে তার লোহার কুঠারটিই বেছে নিল। খুশি হয়ে ফেরেশতা তাকে পুরস্কৃত করল।

৩. উদ্দীপকের কাঠুরিয়ার সাথে 'বালকের সততা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. বৃদ্ধ তাঁতী
খ. করিম বখ্‌শ
গ. বাবলু
ঘ. নয়ন

৪. উক্ত মিলের সবচেয়ে বড় কারণ -

ক. সততা ও বিশ্বস্ততা
খ. সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা
গ. আন্তরিকতা ও ধৈর্য
ঘ. বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

চার সন্তানের জননী রহিমা বেগমের অভাবের সংসার। বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মী সে। একদিন রেলের বগি পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি ব্যাগ খুঁজে পায়। ব্যাগে ছিল অনেক টাকা। ভালো করে খুঁজতেই ওটার মধ্যেই পেল মালিকের ফোন নম্বর। পরে মালিককে ডেকে সে সব টাকা ফেরত দিল। মালিক খুশি হয়ে তাকে বকশিস দিতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে রাজি হলো না। পরে অনেক বুঝিয়ে মালিক রহিমাকে রাজি করাতে সক্ষম হলো।

ক. কত বছর পর করিমের মালিক ফিরে এলো?

খ. 'বলো বাবা, তুমি মানুষ না ফেরেশতা!' বৃদ্ধের এমন উক্তির কারণ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের রহিমা বেগমের কোন গুণটি 'বালকের সততা' গল্পের করিম বখ্‌শ এর মধ্যে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পরিণতির দিক থেকে গল্পটির সাথে উদ্দীপকের কোনো মিল নেই।'–মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মত দাও।

কাঠের পা

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা।

নয় নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন শাজাহানের নেতৃত্বে যে বিশাল মুক্তিবাহিনীর দল গড়ে উঠে, বাবা ছিলেন তাদের একজন। ক্যাপ্টেন শাজাহান ছিলেন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা। বরিশালের বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাঁর বাহিনীর তৎপরতা।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপরে যখন তখন আক্রমণ চালিয়ে ক্যাপ্টেন শাজাহান ও তার গ্রুপ তাদের নাজেহাল করে তুলতেন। বাবা ছিলেন খুব নামকরা মুক্তিযোদ্ধা। তেমনি সাহসী। বাবা বয়সে বড় হলেও ক্যাপ্টেন শাজাহান বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

একবার হলো কী, খালের ওপারে ক্যাম্প বসাল পাকিস্তানি মিলিটারি। তাদের সঙ্গে অনেক রাজাকার। রাজাকাররা তখন অবস্থা খারাপ বুঝে মিলিটারিদের সাথে সাথে ঘুরত। ভাবত, বুঝি অস্ত্রের সাথে সাথে থাকলে তারা নিরাপদে থাকবে।

যাই হোক, ক্যাপ্টেন শাজাহান স্থির করলেন রাতের বেলা খাল পেরিয়ে তাদের আক্রমণ করবেন। সেই হিসেবে আমার সাহসী বাবাকে আগের দিন রেকি করতে পাঠানো হলো। বাবার পরিবেশজ্ঞান ছিল খুব তীক্ষ্ণ। সন্ধ্যেবেলা গোপনে খাল পার হয়ে বাবা ওপারে গিয়ে দেখলেন বিস্তীর্ণ মাঠ। বাবা জঙ্গলের ধার ঘেঁষে মাঠ পার হতে লাগলেন। আর সেই সময় ঘটল বিস্ফোরণ। মাঠের দুধারে ছিল মাইন পাতা, যা বাবা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। মাইনের উপরে সরাসরি পা ফেলতেই বিস্ফোরণে বাবার দুটি পা-ই হাঁটুর নিচ থেকে উড়ে গেল। বাবা জ্ঞান হারালেন।

বাবার পেছনে ছিলেন আর-একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাবাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেলেন গহিন জঙ্গলের ভিতরে। সেখান থেকে পরে তাদের উদ্ধার করা হলো। বাবার মুক্তিযোদ্ধা জীবনের সেখানেই হলো ইতি।

এই ঘটনার পর বাবাকে সীমান্তের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘদিন চিকিৎসা হলো বাবার। দুটো নকল পা তৈরি করে দেয়া হলো বাবাকে। কাঠের নকল পা।

হাতে লাঠি নিয়ে, কাঠের পা লাগিয়ে বাবা আমার নতুন করে হাঁটতে শিখলেন। আস্তে আস্তে এই কষ্ট সয়ে গেল বাবার। বাবা যখন মুক্তিযুদ্ধে, আমি তখন খুব ছোট্ট। এক বছর হয়েছে কি-না সন্দেহ। তাই মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বাবা আমাকে কোলে তুলতেই আমি ভ্যাঁক করে কেঁদে সারা।

আর বাবাও আমাকে কোলে তুলে অপ্রস্তুত।

তারপর আস্তে আস্তে বাবার সাথে ভাব হলো। এখন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, বাবা। আর বাবার বন্ধু, আমি।

বাবাকে আমি খুব ভালোবাসি। তবু মনে হয় কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়।

আমাদের বাড়িতে শুধু আমি আর বাবা থাকি। সরকার কিছু অনুদান দেন। আর বাবা বাড়ি বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্যে কি সব রিপোর্ট তৈরি করেন। এই দিয়ে আমাদের সংসার চলে।

দাদা বাবার জন্যে ছোট একটা বাড়ি রেখে গেছেন। আমাদের তাই বাড়িভাড়া লাগে না।
আমার বয়স ষোল।
বাবার বয়স তেতাল্লিশ।
আমি এইবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি।

পরীক্ষা মোটামুটি হয়েছে।

খুব একটা লেখাপড়া করতে আমার মন চায় না। বাবা মন খারাপ করবেন ভয়ে আমি পড়ি।

আমাদের বাড়িটা কী নির্জন। খাঁচায় একটা ময়না পাখি পুষেছি। বেশির ভাগ সময় আমি তার সঙ্গেই কথা বলি। তাকে ছোলা খেতে দিই। সে আমাকে নয়ন, ও নয়ন বলে ডাকে।

আমার ডাকনাম নয়ন।

বাবা সারাটা সকাল বইপত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। বাসায় একটা কাজের বুয়া আছে। সে রান্নাবান্না করে। আমি আর বাবা খাই।

দুপুরে বাবা ঘুমোতে চলে গেলে, সারা বাড়িতে আমি একা। আমার এই-ই ভালো লাগে। বিকেলে আমার বন্ধু নিয়ামত আসে। আমরা বাড়ির সামনের মাঠে কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলি। সন্ধ্যের আগে আগে চলে যায়।

তারপর আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি বাবা আমার জন্যে চা-নাস্তা সাজিয়ে বসে আছেন।

নাস্তা শেষ হলে আমি আর বাবা গল্প করি।কত গল্প, কত রকমের গল্প। যদিও সেগুলো সত্যি ঘটনা, তবু গল্পের সেরা। উনিশ শো একাত্তরে আমাদের দেশে যে অবিশ্বাস্য মুক্তিযুদ্ধ ঘটে গেছে তার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গল্প করেন বাবা। বাবা বলেন এই দেশের শহরে-গ্রামে, মাঠে-ঘাটে, খালে-বিলে, নদীতে-হাওড়ে, পাহাড়ে-জলাভূমিতে ঘটে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাজারো রকমের 'অপারেশন', যা ইতিহাস হয়ে আছে। আমার ইচ্ছে আমি আর একটু বড় হয়ে এই ইতিহাস পড়ব।

রাতের বেলা বাবা এক ঘরে ঘুমোন, আমি অন্য ঘরে। আগে বাবা আর আমি এক ঘরে ঘুমোতাম। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আগে আমার ঘর আলাদা করে দিয়েছেন বাবা, যাতে আমি অনেক রাত জেগে লেখাপড়া করতে পারি।

সেই থেকে আমি পাশের ঘরে শুই।

বড়দের মতো আলাদা ঘরে শুতে আমার ভালো লাগে। আবার বাবার ঘরে শুয়ে শুয়ে গল্প করতেও ভালো লাগে।

কোনো কোনোদিন বাবাকে চিনতে পারিনি। চেনা বাবা হঠাৎ করে অচেনা হয়ে যান। এরকম হলে সেদিন আর আমার সাথে বেশি কথা-টথা বলেন না বাবা। বই পড়েন না। রিপোর্ট লিখেন না। পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়ান না। পাখিটাকে কথা বলা শেখান না। শুধু চুপচাপ জানালা দিয়ে একমনে তাকিয়ে থাকেন। সেদিন বাবার মন খারাপ হয়।

আমি সেদিন সারাদিন বাবার আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করি। বাবার জন্যে আমার মন কেমন যে করে। বাবাকে খুশি করার জন্যে কত রকমের ফন্দি আঁটি।কিন্তু কোনোটাই করা হয়ে উঠে না।

সেইদিনটাও ছিল যেন বাবার মন খারাপের দিন। সেদিন আবার আকাশে চাঁদ উঠছে খুব বড় হয়ে। পূর্ণিমা- টুর্ণিমা হবে। বাবা সারাদিন চুপ করে বসে ছিলেন। রাতে আমি সাহস করে বাবার কাছে গিয়ে বললাম, বাবা, ছাদে যাবে।

২০১৫

বাবা আমার মুখের দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কেন?

আমি ঢোক গিলে বসলাম।

এই এমনি। আজ অ-নে-ক বড় চাঁদ উঠেছে তো। অনেক আলো আকাশে। কী ভেবে বাবা বললেন, চল।

এরপর বাবা অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তার নকল পা দুটো লাগালেন। কাঠের পা। হাতে লাঠি নিলেন। তারপর একটু একটু করে হেঁটে দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলেন। অনেকক্ষণ লাগল বাবার উঠতে। বাবার পেছন পেছন আমিও ছাদে উঠলাম।

ছাদের উপর লম্বা লম্বা সিমেন্টের ঢালাই। একটা ঢালাইয়ের আবর্জনা পরিষ্কার করে আমি আর বাবা বসলাম।

আমাদের মাথার উপরে চাঁদ তখন হাসছে। চাঁদের হাসি দেখে আমারও খুব হাসি পেল। আমি হেসে বাবাকে বললাম, সুন্দর আলো, তাই না বাবা?

বাবা বললেন, সুন্দর।

এরপর বাবা চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

আমাদের বাড়ির পাশে মন্টুদের বাড়ি। তার পাশে সত্যদের বাড়ি। তার পাশে মেরিনাদের বাড়ি। বাড়িগুলোর পরে লম্বা রাস্তা যত দূর চোখ যায় চলে গেছে। রাস্তার পাশেই খোলা মাঠ। রাতের বেলা একটু কুয়াশা জমে যেন সেটাকে তেপান্তরের মাঠ বলে মনে হচ্ছে। আমাদের বাড়ির সীমানার ভিতরে আম আর কাঁঠালের গাছ। গেটের পাশে সাদা ফুলে ভরা কামিনী গাছের ঝাড়। একটা কাঠবাদামের চারা ছাতার মতো ডানা মেলে আছে উঠোনে।

বাতাসে ফুলের মৃদু সুঘ্রাণ।

বাবা চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন, সুন্দর, আমাদের দেশটা সুন্দর। আমি চুপ করে থাকলাম।

তখন বাবা হঠাৎ করে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তোর খুব মন খারাপ করে, তাই না?

আমি বাবার কথা শুনে হক্‌চকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন?

বাবা বললেন, আমাকে নিয়ে মানুষজনের সামনে তোর খুব লজ্জা হয়, না রে?

আমি বললাম, কেন?

বাবা বললেন, আমি যে তোকে কোথাও বেড়াতে নিতে পারি নে, হৈ চৈ করতে পারি নে, তোকে আনন্দ দিতে পারি নে, আমার যে পা নেই।

বাবার কথা শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, একথা কেন বলছ বাবা?

বাবা আমার দিকে ফিরে কেমন করে যেন হেসে বললেন, তোর সব বন্ধুর বাবার পা আছে। তোর নিশ্চয় মানুষের কাছে বলতে খারাপ লাগে যে, তোর বাবা পঙ্গু। তার দুটি পা-ই নেই।

তুই যখন আরও বড় হবি, তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি কোনোদিনও কারো ঘাড়ে বোঝা হবো না।

বাবার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। আমার বয়স এখন ষোল। যখন আমি খুব ছোট্ট আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে যান, খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নয়টা মাস, দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ক'সপ্তাহ আগে মাইন বিস্ফোরণে বাবা পা হারান। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য করে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন আমার বাবা।

সেই বাবার মুখে এই কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

আস্তে আস্তে বোধশক্তি ফিরে এলো আমার।

আমি বাবার পাশ ঘেঁষে বসলাম। বাবার মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে থেকে বললাম, আমাদের মতো ছেলেদের পাগুলো ঠিক রাখতে গিয়ে তুমি মুক্তিযুদ্ধে নিজের পা হারিয়েছিলে বাবা। তুমি নিজের পা অক্ষত রাখতে চাইলে আজ এই দেশে আমাদের মতো ছেলেরা তাদের দুটো পা-ই হারাত। আমি তোমাকে ছেড়ে কোনোদিন যাব না বাবা। কক্ষনো না।

আমার কথা শুনে মনে হলো বাবার কাঠের পাদুটো কেমন যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। অবশ্য এটা আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কাঠের পা কি কখনো আবেগে কেঁপে উঠতে পারে?

লেখক-পরিচিতি

আনোয়ারা সৈয়দ হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তিনি পেশায় চিকিৎসক। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ছানার নানা বাড়ি (১৯৭৭), বাবার সঙ্গে ছানা (১৯৮৬), ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৮৭) প্রভৃতি। তিনি অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার এবং কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

পাঠ পরিচিতি

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত গল্প। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশের মানুষ মরণপণ লড়াই করে বিজয়ী হয়। এই যুদ্ধে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দান করেন। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত হয়ে স্বাধীন দেশে জীবনযাপন করেন।

এই গল্পের নায়ক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের শেষদিকে একটি অপারেশন আগে রেকি করতে গেলে মাইন বিস্ফোরণে তাঁর দুই পা হাঁটুর নিচ থেকে উড়ে যায়।

চিকিৎসা করানোর পরে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন। তাঁকে দুটো নকল পা লাগিয়ে দেওয়া হয়। একদিন যুদ্ধ শেষ হয়। স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন তিনি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে শুরু করেন নতুন জীবন।

ছেলের যখন ষোল বছর বয়স তখন একদিন তাঁর মনে হয় বড় হয়ে ছেলেটি ওর পঙ্গু বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে নাতো? মুক্তিযোদ্ধার ভীষণ মন খারাপ হয়।

একদিন ছেলেকে এই কথা জিজ্ঞেস করতেই ছেলেটি হতভম্ভ হয়ে যায়। ও বাবার পাশে বসে বলে, বাবা তুমিতো আমাদের মতো ছেলেদের পা ঠিক রাখতে মুক্তিযুদ্ধে নিজের পা হারিয়েছিলে। তুমি তোমার পা অক্ষত রাখতে চাইলে আমাদের মতো ছেলেরা তাদের পা হারাত বাবা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোনদিন কোথাও যাব না।

ছেলের কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধা বাবা গভীর আবেগে কেঁপে উঠেন।

শব্দার্থ ও টীকা

নয় নম্বর সেক্টর	–	১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক অঞ্চল বা সেক্টরে ভাগ করা হয়। খুলনা-সুন্দরবন অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৯ নম্বর সেক্টর।
ক্যাপ্টেন	–	সামরিক কর্মকর্তার পদমর্যাদা বিশেষ।
রাজাকার	–	স্বেচ্ছাসেবক। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহায়ক বিশেষ বাহিনী। এরা বাংলাদেশের মানুষ হয়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে।
রেকি	–	শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের পূর্বে আক্রমণ-এলাকা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়া।
বিস্তীর্ণ	–	ব্যাপক। বহুদূর বিস্তৃত।
মাইন	–	এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধাস্ত্র।
গহিন	–	গভীর। দুর্গম।
অপ্রস্তুত	–	বিব্রত। ভেবে উঠতে না পারা। প্রস্তুত বা তৈরি হয় নি এমন।
অনুদান	–	সাহায্য হিসেবে অর্থ বরাদ্দ।
অপারেশন	–	শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বা আক্রমণ।
রিপোর্ট	–	প্রতিবেদন। কোনো বিষয়ে তথ্য ও বিবরণ প্রদান।
স্তম্ভিত	–	বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছে এমন।

২০১৮

হতভম্ব	–	হতবাক হয়ে যাওয়া। স্তম্ভিত।
অক্ষত	–	আঘাতহীন। কোথাও আঘাত লাগেনি এমন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কার নেতৃত্বে নয় নম্বর সেক্টরে বিশাল মুক্তিবাহিনীর দল গড়ে উঠে?
   ক. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমের
   খ. ক্যাপ্টেন শাজাহানের
   গ. ক্যাপ্টেন হালিমের
   ঘ. ক্যাপ্টেন জামিলের

২. নয়নের বাবার মুক্তিযোদ্ধা জীবনের ইতি হওয়ার কারণ–
   ক. দুটো পা হারানো
   খ. দুটো নকল পা হওয়া
   গ. কাঠের পা হওয়া
   ঘ. যুদ্ধ শেষ হওয়া

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক্র্যাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা আরমান আলী এসে দাঁড়ায় ছেলের চায়ের দোকানে। ছেলে দুটো বিস্কুট আর এক কাপ চা দেয়। আরমান আলী চা খায় আর ভাবে এমন জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো যাকে এক কাপ চায়ের জন্য নির্ভর করতে হয় ছেলের আয়ের উপর।

৩. কাঠের পা গল্পের যে দিক মুক্তিযোদ্ধা আরমান আলীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো –
   i. একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের অসহায়ত্ব
   ii. একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের পরনির্ভরশীলতা
   iii. একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের ইতিহাস

   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. নিম্নের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আরমান আলী আর নয়নের বাবাকে এক সূত্রে বাঁধা যায় তা হলো, এরা দুজনই-
   ক. তিরস্কৃত মুক্তিযোদ্ধা
   খ. নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা
   গ. নিগৃহীত মুক্তিযোদ্ধা
   ঘ. হতাশাগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজলের দাদা রহমান সাহেব হুইল চেয়ারে বসেই চলাফেরা করেন। দাদি কাজলকে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দাদাকে এমনভাবে মেরেছিল যে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। দাদা তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাজল দাদার কাছে জানতে চায়– "এ অবস্থার জন্য তোমার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না?" দাদা বলেন– "আমার মতো এ রকম হাজারো পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার পায়ের উপর ভর করেই তো দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশ।"

ক. খালের ওপারে ক্যাম্প বসিয়েছিল কারা ?

খ. নয়নের বাবাকে কাঠের পা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল কেন?

গ. কাজলের দাদার জীবনে 'কাঠের পা' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কাজলের দাদার উক্তিটি 'কাঠের পা' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চিন্তাশীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে
মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'–দু হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'–এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড় সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় মগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ্।

২০১৫

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

ভাবনার দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল্ দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড় গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে—ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই উঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান]

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি। সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর রোমাঞ্চিত হয় না? অন্তঃকরণ অধীর হয়ে উঠে না? আহা, কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে উঠে! বলো কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র?

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু!

[প্রস্থান]

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়।

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

চারদিকে চাহিয়া

একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে– মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বন্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্টো কথা বললে; মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি–

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে। [প্রস্থান] ১৩০৫

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরির চিন্তামগ্ন ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশ্যে

নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ কর ।

নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না– দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে–

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর কর ।

নরহরি। আদর করব! আচ্ছা এসো, আদর করি।

শিশুকে কোলে লইয়া

কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বলো কী? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, এটা যখন ভেবে দেখা যায় তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দিকি মা!

মা। থাক্ বাবা, সে কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ ও শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্প অল্প মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

মা। (কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হবো।

নরহরি। তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড় বেশি ভাবতে হলো না।

(প্রকাশ্যে)তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছু দিন ধরে ভাবতে হয়। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না– আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

লেখক-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে, (৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে ও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। এশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ পুরস্কার লাভ করেন। একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া তিনি সাহিত্যের সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন। ২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

এই চিন্তাধর্মী নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি হাস্যরসাত্মক রচনা। কথায় আছে–"ভাবিয়া করিও কাজ" কিন্তু বেশি বেশি কোনো কিছুই ভালো নয়। তেমনি বেশি ভাবাও মঙ্গলজনক নয়। নরহরি সব সময় চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে জন্য লেখক তাকে চিন্তাশীল বলেছেন। বেশি চিন্তা করার ফলে সে বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে আছে, সাথে সাথে তার আশপাশের মানুষদেরকেও বিব্রত করছে। নরহরির মতো যারা অকারণে সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে করে সময় নষ্ট করে, তাদের দিয়ে বাস্তবে কোনো কাজই হয় না। তবে কোনো সময়ই কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করব না, এমনটাও ঠিক নয়।

শব্দার্থ ও টীকা : চিন্তাশীল–চিন্তাপরায়ণ, চিন্তা দ্বারা বিচার করতে সমর্থ। **বৎস**–বাছা, স্নেহ সম্বোধনে। বাচ্চা, শাবক, বাছুর। উপস্থিত–বর্তমান, বিদ্যমান, হাজির, নিকটস্থ, সম্মুখবর্তী। কুরুক্ষেত্র–কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র (মহাভারতে বর্ণিত) (কুরু–চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ, কৌরব)। **রোমাঞ্চিত**– অতিরিক্ত আনন্দ, পুলক, ভয়, বিস্ময়ের কারণে গায়ের লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া। **অন্তঃকরণ**–মন, হৃদয়। **অধীর**–চঞ্চল, অস্থির, কাতর, ব্যাকুল, অসহিষ্ণু। **দণ্ডবৎ**–(মূল অর্থ দণ্ডের তুল্য) প্রণাম করার জন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়া। **রোসো** – সবুর কর। **আচ্ছন্ন** – আবৃত, ঢাকা, ব্যাপ্ত, অচৈতন্য, অভিভূত। **পুনশ্চ**–আবারও, পুনরপি (লেখা শেষ করে আবার কিছু লিখতে হলে পুনশ্চ দিয়ে আরম্ভ করতে হয়)। **কাশী**–হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান, বারানসী, বেনারস। **কাশীবাসী**–কাশীধামে তীর্থবাসকারী। স্বগত–আত্মগত, মনে মনে, যা কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ না করে আপন মনে বলা হয়। **শ্মশান**–যেখানে মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানো হয়, শবদাহস্থান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাশী কোন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান ?

ক. হিন্দুদের খ. বৌদ্ধদের
গ. খ্রিষ্টানদের ঘ. মুসলমানদের

২. 'লক্ষ্মী' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়?

ক. নাম খ. সুন্দর
গ. সুবোধ ঘ. আদর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।'

৩. উদ্দীপকে 'চিন্তাশীল' নাটিকার যেদিকটি প্রতিফলিত তা হলো-

i. সকল বিষয়ে অতি ভাবনা
ii. কোনো কাজ শুরু করতে না পারা
iii. জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কোন কারণে নাটিকার নরহরি আর উদ্দীপকের কথককে একসূত্রে বাঁধা যায়? এরা উভয়ই -

ক. বাহুল্য ভাবনায় কর্মবিমুখ খ. অজুহাত প্রবণতায় আক্রান্ত
গ. আলস্যে নিমজ্জিত ব্যক্তিত্ব ঘ. সংশয় সৃষ্টিকারী চরিত্র

সৃজনশীল প্রশ্ন

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল,
সকলে বলিল, 'ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।'

২০১৫

ক. ‘চিন্তাশীল’ নাটিকার লেখকের নাম কী?

খ. ‘আমি কাশিবাসী হবো।’ – উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. যে দিক থেকে উদ্দীপকের নন্দের সাথে ‘চিন্তাশীল’ নাটিকার নরহরির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘শিশুদের সম্পর্কে নরহরির ভাবনা উদ্দীপকে অনুপস্থিত’ কথাটি ব্যাখ্যা কর।

অমি ও আইসক্রিম’অলা

ফরিদুর রেজা সাগর

উঠোনের কোণার দিকে বিশাল যে গাছটা সেটা একটা নিমগাছ। নিমপাতা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। চারপাশের গাছের এত সবুজ রঙের পাতা। ঘাসের বনে ছোট ছোট রঙিন ফুল আবার মনটাকে অন্যরকম করে দেয়। কিছুক্ষণ আগে শোনা যাচ্ছিলো ঘুঘুর ডাক। একটু আগে একটা রঙিন পাখিও চোখে পড়েছে। পাখির পালকে অনেক রং। নাম না জানা পাখিটার একটা নাম ঠিক করে ফেলে অমি। পাখির নাম রঙিলা।

ঠিক সে সময় চোখে পড়ল নীল রঙের হাফপ্যান্ট আর নীল রঙের হাফশার্ট পরা একটা লোক। দুচাকা’অলা একটা কাঠের বাক্স ঠেলে সামনে নিয়ে আসছে। লোকটা হেঁড়ে গলায় ডাক দিচ্ছে–আইসক্রিম।

এই জঙ্গলের মধ্যে লোকটা আইসক্রিম কার কাছে বিক্রি করবে? প্রথমেই প্রশ্নটা অমির মাথায় এলেও পরে মনে হলো লোকটা কোথায়, কার কাছে, আইসক্রিম বিক্রি করবে তার জানার দরকার কী? বরং লোকটাকে ডেকে একটা আইসক্রিম কেনা যায়। জানালা দিয়ে অমি ডাক দেয়– আইসক্রিম’অলাকে।

দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াতেই আইসক্রিম’অলা বলে, কী আইসক্রিম খাবেন?

বাপরে! এই জঙ্গলে আইসক্রিম পাওয়া যাচ্ছে এটাতো বেশি। তারপর আবার কী আইসক্রিম পাওয়া যাবে তার পছন্দেরও সুযোগ রয়েছে। ভীষণ অবাক হয় অমি। কিন্তু মুখে বলে,

কী ধরনের আইসক্রিম রয়েছে?
ভ্যানিলা, চকলেট, স্ট্রবেরি–আপনার কোনটা লাগবে?
ভ্যানিলাই দিন।
আপনি কি নতুন এসেছেন?
হাঁ।
কালাম সাহেব কোথায়?
অফিসে। আপনি কালাম সাহেবকে চিনেন?
তিনি আপনার কে হন?
মামা।
আপনি বেড়াতে এসেছেন?
ঠিক বেড়াতে নয়।
তবে ময়মনসিংহ যাচ্ছিলাম। গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়–
ও বুঝেছি! গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কালাম সাহেবের এখানে এসেছেন।
আজই কি চলে যাবেন?
আজ নয় কাল ফিরব। অমি বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর।
আগে আরও সুন্দর ছিল ।
সেটা কী রকম?
এই বাড়িটা জমিদার রায় বল্লভ রায়ের।
রায় বল্লভ রায়।
হ্যাঁ। খুব কম জমিদারই আছে যাদের নামের আগে পরে দুবার রায় লেখা হয়।
সেই জমিদার এখন কোথায়?
এই বাড়ির ভিতরেই আছে।
মানে?
বসার ঘরে। জমিদার সাহেবের একটা বিশাল ছবি টাঙানো আছে।
ও। আমার পুরো বাড়ি দেখা হয় নি।
সময় পেলে দেখে নিবেন।
আমার আইসক্রিম দিলেন না?
মুখে যদিও লোকটা বলল ও! তাইতো।
কিন্তু তারপরই আবার অমিকে বলল, একসময় এই বাড়িটার অনেক জৌলুস ছিল।
সেটা অবশ্য আমি কাল রাতেই বুঝেছি।
কেমন করে?
মামা বললেন, বাড়িটা অনেক বড়। এত রাতে দেখার দরকার নেই।
তাই বুঝি খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছেন?
হ্যাঁ।
বাড়ির ভিতর একটা ফোন রয়েছে। অবশ্য ফোনটা এখন নষ্ট। নষ্ট হবারই কথা। এই বাড়ির অনেক কিছুই এখন নষ্ট। ২০১৫

কী রকম?
পুরো বাড়ির প্রত্যেক ঘরে বড় দেয়াল ঘড়ি ছিল। সেগুলো সবই নষ্ট। বসার ঘরে টানা পাখা ছিল। সেটাই এখন কেউ চালায় না।
টানা পাখা নষ্ট হয় কখনো?
নষ্ট হয় না। কিন্তু দড়িগুলো সব পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গেছে।
বাড়িটার কেউ কোনো যত্ন নেয় না কেন?
সে প্রশ্ন তো আমারও।
এই ধরনের বাড়ির সরকারের উচিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। আপনার মতো সবাই যদি ব্যাপারটা বুঝতে পারত..... যাই হোক গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। একগ্লাস পানি খাওয়াবেন?
ভারি মজার ব্যাপার তো? কোনো আইসক্রিম’অলা পানি খেতে চায়? এমন কথা কখনো শোনেনি অমি। অবশ্য ময়রা নিজের মিষ্টি খায় না। সুতরাং আইসক্রিম’অলা নিজের আইসক্রিম না-ও খেতে পারে।
আপনি দাঁড়ান। আমি পানি এনে দিচ্ছি।
বাড়িতে আর কেউ নেই?
নাহ। আবদুল চাচা ছিলেন। তিনিও বাজারে গিয়েছেন।
দুঃখিত। আমার জন্যে আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।
না, না। পানি খেতে চেয়েছেন তো কষ্টের কী আছে?
অমি ঘরের ভিতরে চলে যায়। ওর ঘরে জগের মধ্যে পানি রাখা। জগ থেকে গ্লাসে পানি রাখতে গিয়ে অবাক অমি। কী আশ্চর্য। জগ একদম খালি। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে– আবদুল চাচা জগ ভরে পানি রেখে বলে গিয়েছিল,
এই জগে পানি রইল। বিকেলে আবার পানি ফোটাব।
অমি বলেছিল, আর দরকার হবে না। এক জগ পানিতে আমার কাল সকাল পর্যন্ত চলবে।
আবদুল চাচার কথায় বোঝা যাচ্ছে ঘরে আর খাবার পানি নেই। বাথরুমের কলের দিকে চোখ পড়ে অমির। কিন্তু কলের প্যাঁচ খুলছে না।

দুই

এত বড় বাড়ি। কোথায় খুঁজবে পানি। অমি খালি গ্লাসটা নিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায়।
কী পানি পেলেন?
মাথা নিচু করে থাকে অমি।
দেখলেন তো এত বড় বাড়ি কিন্তু একফোঁটা পানি পেলেন না। কী দুর্ভাগ্য। সত্যি ব্যাপারটা বড় দুর্ভাগ্যের। এই দুর্ভাগ্য এড়াতে পারে নি রাজা রায় বল্লভ রায়ও।
রাজার আবার দুর্ভাগ্য হয় কী করে?
সেই তো কথা। যে রাজার নামের ডাকে সব প্রজারা এক হয়ে যেত সেই রাজার ভাগ্যের এমন পরিণতি হবে তা কেউ ভাবে নি।
কী হয়েছিল রাজার?
একাত্তরের কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঘটনাটা ঘটেছিল।
কী ঘটনা?

ঠিক সেসময় হঠাৎ করে গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। ড্রাইভার বোধহয় গাড়ি নিয়ে ফিরে আসছে। অমি আইসক্রিম'অলাকে বলল,

আমাদের গাড়ি ফিরে আসছে। গাড়িতে পানির বোতল আছে। আপনাকে পানি দেব।

ঠিক আছে। তবে বোধহয় সেটা লাগবে না।

অদ্ভুতভাবে লোকটি দুই চাকা'অলা আইসক্রিমের কাঠের বাক্সটা নিয়ে কিছু বলার আগেই নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ড্রাইভার এসে চাবি দিয়ে চলে যায়। আর কী আশ্চর্য-ভোজবাজির মতো আবার আইসক্রিম'অলা আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে উপস্থিত হয় অমির সামনে। হঠাৎ করেই অমির মনে হলো, একটু আগে যে আইসক্রিম'অলাকে অমি দেখেছিল সেই একই আইসক্রিম'অলা। কিন্তু তার বয়স বেড়ে গেছে অনেক। আগের আইসক্রিম'অলার মোচ ছিল কিনা সেটাও মনে করতে পারছে না অমি।

আপনি আবার ফিরে এলেন যে।

আপনার আইসক্রিমটা দিতে ভুলে গেছি।

আমিও পানি দিতে ভুলে গেছিলাম।

এই কথা বলে অমি গাড়ির দিকে এগোয়।

আইসক্রিম'অলা বলে, এখন পানি আর খেতে ইচ্ছা করছে না। বরং আপনি কী আইসক্রিম যেন খাবেন বলেছিলেন।

যখন অমি তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিল তখন ঐটুকু সময়ের মধ্যে লোকটা কোথায় গিয়েছিল? অমির কথাটা মনে হওয়ার কারণ আইসক্রিম'অলা লোকটি হঠাৎ যেন খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে।

আপনি আমাকে রাজা রায় বল্লভ রায়ের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে যাচ্ছিলেন।

কার গল্প!

অমি আবার বলে, রাজা রায় বল্লভ রায়।

আমি শুনতে পাচ্ছি না। একটু জোরে বলবেন?

চিৎকার করে অমি বলে। রাজা রায় বল্লভ রায়।

এই নাম আপনি কোত্থেকে জানলেন অমি সাহেব?

অমি হঠাৎ খেয়াল করে ওর পুরো গা ধরে ঝাঁকাচ্ছে বাড়ির কেয়ারটেকার আবদুল চাচা। আর বলছে, এই নাম আপনি কী করে জানলেন?

ঐ তো উনি বলেছেন।

কে বলেছেন?

ঐ আইসক্রিম'অলা।

এই জঙ্গলে আইসক্রিম'অলা আসবে কোথা থেকে? কী বলছেন অমি সাহেব।

এই তো এখনই আমার সাথে কথা বলছিল। কোথায় গেল? কিছুক্ষণ আগে ড্রাইভার আসার সময় যেমন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আইসক্রিম'অলা আবদুল চাচা আসার সময়ও ঠিক সেরকম কাণ্ড ঘটেছে। চোখের সামনে কেউ নেই।

গেল কোথায় লোকটা? চাচা এদিকে আসেন, খুঁজে দেখি।

খোঁজার দরকার নাই।

২০১৫

কেন?
সত্যি সত্যি কেউ আসে নি।
বিশ্বাস করেন আবুদল চাচা, আমি অনেকক্ষণ ধরে লোকটার সাথে কথা বলেছি। এমনকি তার জন্যে পানিও আনতে গেছি।
বলতে বলতে অমি আবদুল চাচাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।
লোকটিকে তুমি পানি দিয়েছিলে?
কেমন করে দেব? তুমি জগে পানি রেখে যাও নি?
আমি নিজের হাতে পানি রেখে গেছি। এইতো জগ-ভরা পানি।
আবদুল চাচা সামনে গিয়ে জগটা দেখায়। অমি অবাক হয়ে দেখে, তাইতো! জগ-ভরা পানি। একটু আগে অমি তাহলে কী দেখেছে?
আমি কলেও পানি পাই নি।
কেন?
কলের প্যাঁচ খুলছিল না।
এই বাড়ির সবগুলো কলের প্যাঁচ উল্টোদিকে। সেটা আপনি বুঝতে পারেন নি।
উল্টোদিকে কেন?
রাজা রায় বল্লভ রায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন। আমেরিকায় কল উল্টোদিক ঘোরালে পানি আসে। লাইটের সুইচ উল্টোদিকে টিপে বাতি জ্বলে। এ বাড়ির সবকিছু সেই আমেরিকার নিয়মে করে গেছেন রাজা মশাই।
সেই রাজা মশাই কোথায়?
সেটা কেউ জানে না।
জানে না মানে?
একাত্তর সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এই বাড়িতেও ঢুকেছিল। শোনা যায়, সেই সময় স্থানীয় একজন মাতব্বর মাহতাবউদ্দিন রাজাকে খুন করে এই বাড়ির দখল নিয়েছিল।
রাজাকে খুন করে?
হ্যাঁ। পঁচিশ মার্চের পরে রাজার পুরো পরিবার বিদেশে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাজা বলতেন, তিনি এই এলাকার রাজা। প্রজাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না। তবে তার দুর্ভাগ্য পাকিস্তানি সৈন্যদের আসার খবর পেয়ে তার দেহরক্ষী ও প্রজারা সবাই পালিয়ে গিয়েছিল।
মাহতাবউদ্দিন আহমদ এখন কোথায়? পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, মাঝে মাঝে এই বাড়ি দখল নেয়ার চেষ্টা সে নানাভাবে করে। কিন্তু আপনার মামার জন্য সেটা সম্ভব হয় নি। বরং এই এলাকার অনেকে এই ঘটনা জানতে পেরে এখনও মাঝে মাঝে মাহতাবউদ্দিন আহমেদের বিচার দাবি করে।
কিন্তু রাজা রায় বল্লভ রায় যে মারা গেছেন তার কোনো প্রমাণ আছে?
না। সেটাই সবচেয়ে বড় রহস্য। তবে লোকে বলে এই এলাকায় মাঝে মাঝে রাজা রায় বল্লভ রায়ের মতো একই চেহারার মানুষ দেখা যায়।
আমিও কি আজ সেরকম কাউকে দেখেছি?
জানি না। কিন্তু এর আগেও শুনেছি এই বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাজার চেহারার মতো অনেককে দেখা গেছে।

রাজা এই বাড়ির ভিতরে এসেছেন এমন কাউকে শোনা গেছে? না। তবে তার একটা বড় কারণ ঠিক বাড়ির সামনে যে নিমগাছটা রয়েছে সেটা।

নিমগাছে তো ভূত থাকে শুনেছি।

লোকে সেটা বলে। কিন্তু আসলে অনেক গুণ রয়েছে। অমি আর কথা আগায় না। নিমগাছের ভূত-এসব আলোচনা তার ভালো লাগছে না। আবদুল চাচা এই সময় বলে, এই বাড়ির কাচারিঘরে রাজার একটা ছবি রয়েছে দেখবেন?

হ্যাঁ-অবশ্যই।

কাচারিঘরের দিকে এগোয় অমি। দেয়ালে একটা বিরাট তৈলচিত্র। একটু আগে যে আইসক্রিম'অলার সঙ্গে অমি কথা বলছিল হুবহু সেই চেহারা। শুধু ছবির লোকটার পরনে রাজকীয় পোশাক।

এই হলো রাজা রায় বল্লভ রায়ের ছবি। আর রাজার প্রিয় খাবার ছিল আইসক্রিম। বলা হয়, তিনবেলাই খাবারের সঙ্গে রাজা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করতেন।

তিন

অমি নটরডেম কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ভূতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এটা কোনোমতেই মানতে রাজি নয় সে। কিন্তু একজন আইসক্রিম'অলার সাথে তার কথা হয়েছে সেই ব্যাপারেও কোনো ভুল নেই। আবদুল চাচা নিমগাছের কথা বলে আসলে ভূতেরই ইঙ্গিত দিয়েছে সেটা বুঝতে পারছে অমি। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাল সকালে এই বাড়ি ছেড়ে অমি চলে যাবে। কোনোদিন আর এই বাড়িতে ফিরে আসবে কিনা তা সে জানে না।

কী? আপনার আইসক্রিমটা নেবেন না?

চমকে সামনের দিকে তাকায় অমি।

সেই আইসক্রিম'অলা। সেই কাঠের বাক্স।

আপনি আইসক্রিম দেবেন কেমন করে।

কেন এই বাক্স থেকে।

বাক্সে কী আছে জানি না। কিন্তু আপনি যে আইসক্রিম'অলা নন সেটা আমি জানি।

তোমাকে আবদুল সব বলে দিয়েছে?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কেন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কী চান?

আমি যা চাই তা তুমি দিতে পারবে?

কেন পারব না? স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ইচ্ছা করলে সবই পারি।

তাহলে যে লোকটি আমাকে মেরেছে, আমার বাড়ি ধ্বংস করেছে তার বিচার করতে হবে। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের বিচার করতে হবে।

অমি ভাই তুমি কোথায়, দ্যাখো কী সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে। পেছন থেকে আবদুল চাচার চিৎকার এবং একই সাথে চোখের সামনে থেকে আইসক্রিম'অলা তথা রাজা রায় বল্লভ রায়ের ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

কী হয়েছে আবদুল চাচা, এমন চেঁচাচ্ছেন কেন?

কাচারিঘরে এসো, দ্যাখো কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটছে।

আবদুল চাচা হাত ধরে প্রায় দৌড়ে নিয়ে যায় কাচারিঘরের দিকে।আগে খেয়াল করে নি অমি। রাজার যে ছবিটা রয়েছে সেই ছবিটায় রাজার একটা হাত উপরে উঠে রয়েছে।

আর সেই হাতে ধরা রয়েছে একটা আইসক্রিম।

এই আইসক্রিম থেকেই পানির মতো চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে কোনো একটা তরল পদার্থ। আর যেখানেই তরল পদার্থ পড়ছে সেখান থেকেই ছবির অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ছবির প্রায় অর্ধেক অংশ সাদা হয়ে গেছে।

আবদুল চাচা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তবে অমি বোধহয় জানে এই ছবিটা যেমন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তেমনি রাজা রায় বল্লভ রায় এই এলাকার মানুষের চোখের সামনে আর আসবে না। কারণ তিনি তার শেষ ইচ্ছার কথা অমিকে জানিয়ে গেছেন।

লেখক-পরিচিতি

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ সালে ফরিদুর রেজা সাগর ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। বাবা ফজলুল হক এদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সাংবাদিকতার পথিকৃত এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক ছিলেন। ফরিদুর রেজা সাগর শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০০৫ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক ফরিদুর রেজা সাগরের লেখা 'ছোট কাকু সিরিজ' ছোট বড় সকলের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অভিযান, রহস্য, ভ্রমণ, স্মৃতিকথা, ভূত, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি তাঁর প্রিয় বিষয়। এইসব বিষয় নিয়ে কেবল ছোটদের জন্য তিনি প্রায় পঁচিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। চলচ্চিত্র প্রযোজনার জন্য পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। বর্তমানে তিনি ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড এবং চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

সারসংক্ষেপ :

ফরিদুর রেজা সাগর রচিত 'অমি ও আইসক্রিম'অলা' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রূপকাশ্রয়ী গল্প। ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে গাড়ি নষ্ট হওয়ায় রাস্তার পাশে বনের মধ্যে একটি পরিত্যক্ত জমিদারবাড়িতে নটর ডেম কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অমিকে অবস্থান করতে হয়। সেখানে তার মামা থাকেন। বাড়িতে আছে একজন কেয়ারটেকার আবদুল। বাড়িটি মুক্তিযুদ্ধ শহিদ জমিদার রায় বল্লভ রায়ের। অমি যখন একা থাকে তখন একজন আইসক্রিমঅলাকে দেখতে পায়। মানুষের সমাগম হলে আবার সে হারিয়ে যায়। এ আইসক্রিমঅলাই জমিদার রায় বল্লভ রায়ের অশরীরী আত্মা। যুদ্ধাপরাধী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বিচারে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার জন্য–অমির কাছে তিনি তার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শব্দার্থ :

জৌলুস — চাকচিক্য, উজ্জ্বলতা। টানাপাখা — হাত দিয়ে রশির সাহায্যে যে পাখা টানা হয়। টেনসন — দুশ্চিন্তা। ভোজবাজি — ইন্দ্রজাল। ময়রা — যে মিষ্টি তৈরি করে। কেয়ারটেকার — তত্ত্বাবধায়ক। তৈলচিত্র— তেলরঙে অঙ্কিত ছবি। কাচারিঘর — সাধারণত বাহিরের মানুষের ব্যবহারের জন্য মূল ঘরের একটু দূরে যে ঘর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অমি কোন ধরনের আইসক্রিম খেতে চেয়েছিল?

ক. চকলেট　　খ. স্ট্রবেরি
গ. ভ্যানিলা　　ঘ. চকবার

২. অমি জায়গাটিকে সুন্দর বলেছিল কেন?

ক. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে
খ. জমিদার বাড়ির সৌন্দর্য দেখে
গ. মানুষের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে
ঘ. থাকার নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সোহেল বেড়াতে গিয়েছিল গ্রামে তার দাদার বাড়িতে। রাতে যে ঘরে তাদের শোবার ব্যবস্থা হলো তার চাল টিনের। হালকা ঝড়-বৃষ্টি হলো সারারাত ধরে। টিনের চালে থেকে থেকে কী যেন একটা একবার এপাশে আর একবার ওপাশে সরে সরে যাচ্ছে। সোহেল সমস্ত রাত গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকল। ভয়ে তার ঘুম এলো না। কারণ সে শুনেছে গ্রামে বরইগাছে খারাপ কিছু থাকে।

৩. গল্পের অমির সাথে কোনদিক থেকে উদ্দীপকের সোহেলের তুলনা করা যায়?

ক. তারা দুজনই ভ্রমণ পিপাসু
খ. দুজনই পড়োবাড়িতে উঠেছিল
গ. তারা অশরীরী আত্মায় বিশ্বাসী
ঘ. দুঃসাহসিক অভিযান তাদের প্রিয়

৪. অমি আর সোহেলের ধারণা পরিবর্তন ঘটানো যাবে তাদের –

i. ভূত সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে
ii. ভূতের দু-একটি ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে
iii. নিজ নিজ গ্রামে বেড়াতে নিয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নেওয়াজ দশম শ্রেণিতে পড়ে। সে বন্ধুদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখতে যায়। ঘুরে ঘুরে জাদুঘর দেখে তার যেমন গৌরববোধ হয় তেমনি কান্নাও পায়। সে গৌরববোধ করে। তার দাদা একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। তার কাছে মনে হলো– শহিদ মুক্তিযোদ্ধারা যেন চিৎকার করে বলছেন– 'না, না-ঘাতকদের ক্ষমা করো না।'

ক. আইসক্রিম'অলা অমির কাছে কী চেয়েছে?

খ. "ভোজবাজি" বলতে কী বোঝায়?

গ. গল্পের অমির কোন দিকটি উদ্দীপকের নেওয়াজের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মূল চেতনায় 'অমি ও আইসক্রিম'অলা' এবং উদ্দীপক অভিন্ন বক্তব্যের ধারক।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২০১৫

রসুলের দেশে

ইবরাহীম খাঁ

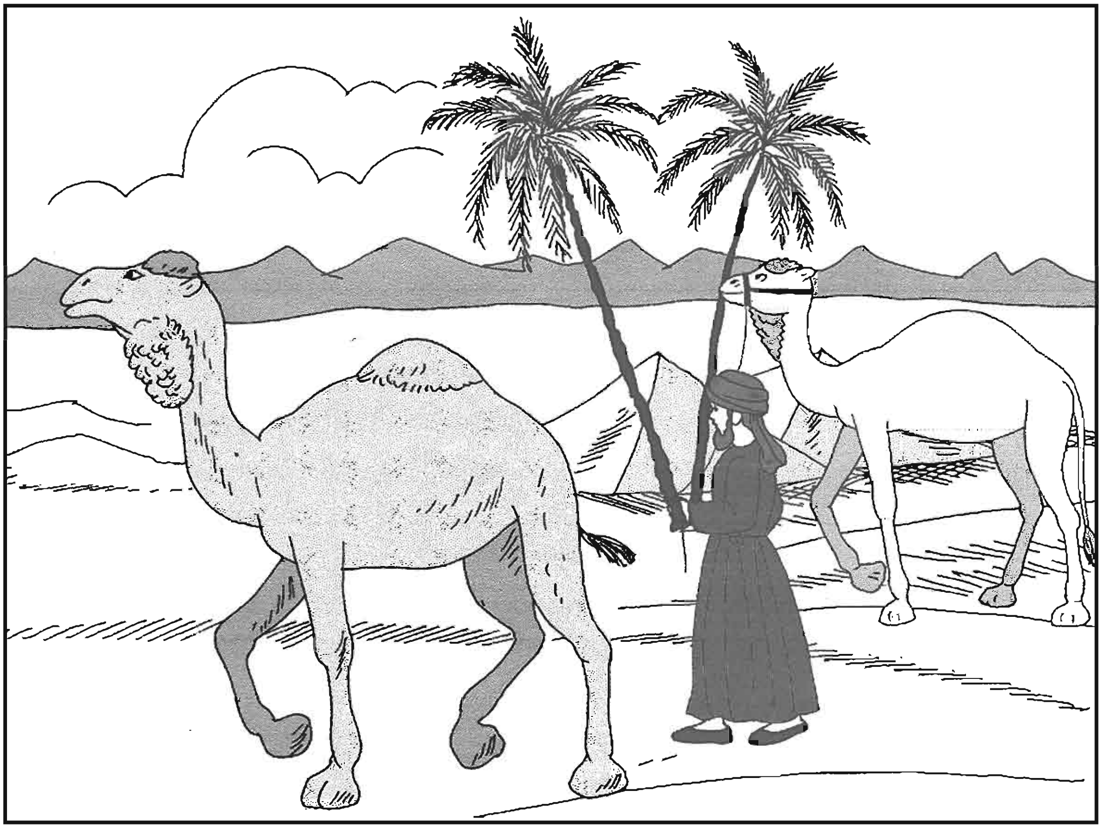

এই সেই জেদ্দা যার কথা শৈশব হতে শুনে আসছি। নামের পরশে চিত্ততলে জেগে উঠেছে কত দূরদূরান্তের স্বপন। কত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী। কত ব্যথা-বিদগ্ধ স্মৃতি। দেশ-দেশান্তরের কত হজযাত্রী এই জেদ্দায় জাহাজ হতে নামে, এসেছি রসুলুল্লাহ্, তোমার দেশে এসেছি, এসেছি, আল্লাহ্, তোমার প্রথম এবাদত-গাহের মুলুকে এসেছি বলে কত আকুল প্রাণ কেঁদে উঠে। উত্তেজনার আতিশয্যে কত বয়োদুর্বল যাত্রী এখানেই ঢলে পড়ে, তাঁদের মক্কা-মদিনা জিয়ারত আর হয়ে উঠে না; তারা প্রতীক্ষমাণ আপন জনের এ-দুনিয়ার ঘরেও আর ফিরে যায় না।

সমগ্র আরবের ছবি মনের চোখে ভেসে উঠল।

সেমিটিক জাতিসমূহের লালন-ভূমি এই আরব। এই আরবদেরই এক শাখা ব্যাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিলিস্তিন, আবিসিনিয়া এদের দিয়েই আবাদ হয়। বিভিন্ন রকম শিলালিপি হতে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসার কম-সে-কম হাজার বছর আগে আরবে এক বিরাট সভ্যতা বর্তমান ছিল। তারপর আসে পতনের যুগ।

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকার, বল্গাহীন অনাচার আর জুলুম। মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহাম্মদ (স.); নতুন আলোকের পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠে। দিকে দিকে গড়ে উঠে নতুন নতুন জাতি, নতুন নতুন রাজ্য, নতুন নতুন সভ্যতা। তারপর মুসলমানের জাতীয় জীবনে শুরু হয় অবনতির ভাটা, ইসলামের সত্য সনাতন আদর্শ ভুলে তারা চলে ভুল পথে, ডেকে আনে নিজেদের মৃত্যু। আজরাইল শিয়রে এসে বসে জান কবজ করতে তৈরি হয়।

এমন সময় আবির্ভাব ঘটে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের। মধ্য আরবের অন্তর্গত আযাইনাতে জন্ম। বসরা, দামেস্ক ও মক্কায় অধ্যয়ন শেষ করে এই সংস্কারক ১৮৫০ সালে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন ও ঘোষণা করেন মুসলমানেরা ইসলামের পথ হতে অনেক অনেক দূর সরে গিয়েছে– তাদের আজকের এই দুর্বলতা, এই বেইজ্জতি এরই জন্য। অতএব মুসলমানকে আগের পথে ফিরে যেতে হবে, ধর্মে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই তার পুনর্জীবন লাভের একমাত্র পথ। যা ইসলামের বিরোধী– তার সাথে কোনো আপস নেই, কারণ সে আপসের পরিণাম জাতির অধঃপতন।

আযাইনার আমির আব্দুল ওহ্হাবকে আপদ মনে করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি আশ্রয় পেলেন দারিয়া-র আমির উদারহৃদয় ইবনে সউদের কাছে। মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওহ্হাবের আহবানে দলে দলে বেদুঈন এসে তাঁর এই সংস্কারপন্থী মত গ্রহণ করতে লাগল এবং নতুন নতুন সংস্কারের জন্য পাগল হয়ে উঠল। আর এদিকে মুহম্মদ ইব্‌নে সউদ তাঁদের সমর-শিক্ষায় নিপুণ করে তুলতে লাগলেন। এই নবগঠিত সৈন্যদলের সাহায্যে মুহম্মদ ইব্‌নে সউদ কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আরবে তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন।

এমনিভাবে আরবে সউদি শক্তি শিকড় গেড়ে বসল।

মুহম্মদ ইব্‌নে সউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজ পিতার রাজ্যের সীমাকে আরও প্রসারিত করেন। আরব তখন তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এবার তুর্ক প্রভুদের টনক নড়ল। তাঁরা তাঁকে দমন করতে লোক-লস্কর পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তুর্ক সৈন্যরা কিছু করতে পারল না; ফিরে গেল। শোনা যায়, আবদুল আজিজ তুর্ক আক্রমণের জওয়াবে কারবালা ও মক্কা দখল করে সেখানকার মাজারগুলোকে একে একে ধূলিসাৎ করে ফেলেন ও বহু পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন লুট করে নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। আব্দুল আজিজের এই ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে একজন শিয়া একদা দারিয়ার মসজিদে হঠাৎ আক্রমণ করে আবদুল আজিজকে হত্যা করেন।

এমনিভাবে কখনো জোয়ার কখনো ভাটার ভিতর দিয়ে সউদি শক্তি কালের তীর বেয়ে চলতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তখন শাহ্জাদা আবদুল আজিজ পিতা আব্দুর রহমানের সাথে কুয়েতে নির্বাসিত, ক্ষমতা তখন মুহম্মদ ইবনে রশিদ নামক এক বিচক্ষণ আমিরের কুক্ষিগত। মাত্র কয়েকজন অনুচরসহ একদা শাহজাদা আব্দুল আজিজ পিতার তাঁবু হতে বের হয়ে ধূসর মরুর দুস্তর পথে বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর এদিক-সেদিক ওঁত পেতে থেকে এক রাতের অন্ধকারে রাজধানী রিয়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, শাসনকর্তাকে পরাজিত করে হত্যা করলেন, তারপর নিজকে রিয়াদের আমির বলে ঘোষণা করে চারদিকে তাঁর শক্তিবৃদ্ধির কাজে মনে-প্রাণে লেগে গেলেন। ইনিই সৌদি আরবের অধিপতি মহামান্য রাজা আবদুল আজিজ ইবনে সউদ।

আজ এ আমির, কাল ও আমিরের সঙ্গে মিলে আবদুল আজিজ আপনার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আবদুল আজিজ ব্রিটিশ পক্ষ গ্রহণ করে নিজের শক্তিবৃদ্ধির নতুন নতুন পথ খুঁজতে লাগলেন। এদিকে মক্কার শরীফ হোসেন ইবনে আলী তুর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে আরব দেশগুলোর রাজা বলে ঘোষণা করে বসলেন। আবদুল আজিজ চাপা হুঙ্কারে কেবল বললেন–

বটে! আচ্ছা !! অবশেষে ১৯১৭ সালে আব্দুল আজিজ ও শরীফ হোসেনের মধ্যে রণভেরী বেজে উঠল। আব্দুল আজিজের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে শরীফের সৈন্য টিকতে পারল না।

১৯২৫ সালে আব্দুল আজিজ তায়েফ, মক্কা ও মদিনা দখল করে নিলেন। এমনিভাবে তিনি নেজ্‌দ ও হেজাজের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

হজ উপলক্ষে যে আয় হয় এতকাল পর্যন্ত তাই ছিল সৌদি আরবের প্রধান সম্পদ। সে আয় আজো আছে; কিন্তু ইদানীং তেলই সৌদি আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্য উপসাগরের তীরে বাহ্‌রান নামক স্থানে এই তেলের খনি—এক মার্কিন কোম্পানি এই তেলের ব্যবসা করছে; সৌদি আরব অচিরেই ধনী দেশের মধ্যে গণ্য হবে। মক্কা-মদিনার মধ্যস্থ একস্থানে একটি সোনার খনিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সুলতান আব্দুল আজিজের প্রভাবের পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছি। শরীফীয় আমলে ডাকাতের জুলুমের অন্ত ছিল না। কাফেলা ছেড়ে কোনো যাত্রী একটু পেছনে পড়লে সে ফিরবে, না কোনো ডাকাতের পাথরের আঘাতে পথেই পড়ে থাকবে, তার নিশ্চয়তা ছিল না। কোনো সময় কাফেলাই আক্রমণ করে বসত। এখন সেসব কিছুই নেই। চুরিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। জেদ্দা হতে মদিনা সে যুগে উটের পিঠে ১২ দিনে যেতে হতো।এখন মোটর বাসে দুই দিনে যাওয়া যায়; হাওয়াই জাহাজে যেতে লাগে দেড় ঘণ্টা। পানির ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আগের দিনে মাছির জ্বালায় ঠিক হয়ে বসার জো ছিল না; সেই ডরে আমরা মশারি নিয়েছিলাম। কিন্তু বাক্স হতে মশারি বের করতে হয় নি। মক্কা ও জেদ্দায় ভালো ভালো রাস্তা ও দালান-কোঠা তৈরি হচ্ছে– শুনলাম মার্কিন পরিকল্পনা মোতাবেক। মক্কার বাজারে রেশম পশমের পোশাক-পরিচ্ছদও যে পরিমাণ দেখলাম, ঢাকার বাজারে তা নেই।

সৌদি আরবের দিন দিন উন্নতি হোক। আমরা এই কামনা করি।

লেখক-পরিচিতি

ইবরাহীম খাঁ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে টাংগাইল জেলার শাবাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও বি.এল. পাস করে প্রথমে ময়মনসিংহ শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে শিক্ষকতায় যোগদান করে দীর্ঘদিন করটিয়া সা'দত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ছোটগল্প, নাটক, রম্য রচনা ও উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

লেখক রসুলের দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে জেদ্দায় অবতরণ করেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল আরবের ছবি। সেমিটিক জাতিসমূহের লালনভূমি আরব দেশ। এ আরব দেশের একটি শাখা ব্যাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরব ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ সময় আরবের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে আসেন শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। দিকে দিকে গড়ে উঠে নতুন সভ্যতা। এক পর্যায়ে আবার শুরু হয় মুসলমানদের অবনতি। এমন সময় আবির্ভাব হয় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাবের। ইসলামের জাগরণের কাজ শুরু হয়। তাঁকে আপদ মনে করে আযাইনার আমির রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দারিয়া-র আমিরের আশ্রয় লাভ করে তিনি পুনরায় মুসলমানদের জন্য কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আরবের অধিপতি আবদুল আজিজ একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন।

শব্দার্থ

জেদ্দা – সৌদি আরবের একটি শহর ও সামুদ্রিক বন্দর। **চিত্ততলে** – মনের মাঝে। **কল্পকাহিনী** – আজগুবি কাহিনী বা গল্প। **এবাদত** – প্রার্থনা, মোনাজাত। **শিলালিপি** – পাথরে খোদিত লেখা। **মরুসূর্য**–মরুভূমিতে যে সূর্য উঠে। এখানে ইসলামের শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে মরুসূর্য বলা হয়েছে। **অন্ধকার** – আঁধার। **শতাব্দী** – শতবর্ষ কাল। **সংস্কারক** – যে সংস্কার করে, উৎকর্ষ সাধক। **সনাতন** – অনাদিকাল হতে প্রচলিত, যা পূর্বে ছিল। **আবির্ভাব** – উপস্থিত হওয়া। **বিচক্ষণ** – বুদ্ধিমান। **রণভেরী** – যুদ্ধের বাজনা। **কাফেলা** – যাত্রীদল। **অধিপতি** – রাজা, প্রভু। **মক্কা** – সৌদি আরবের একটি শহর। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই কাবা শরীফ অবস্থিত। **মদিনা** – আরবের একটি শহর, মুসলমানদের তীর্থস্থান। **আজরাইল** – একজন ফেরেশতা, তিনি মানুষের জান কবজ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জেদ্দা হতে মদিনা যেতে হাওয়াই জাহাজে কতক্ষণ সময় লাগে?

ক. দুই দিন   খ. দেড় ঘণ্টা
গ. দুই ঘণ্টা   ঘ. তিন দিন

২. মুহাম্মদ (সঃ) কে 'মরুসূর্য' বলা হয়েছে কারণ তিনি–

ক. ইসলামের প্রবর্তক   খ. নতুন সভ্যতার জনক
গ. বেদুঈনদের শত্রু   ঘ. মদিনার বাদশা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুসা মুহম্মদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর এলাকায় উন্নয়নে মনোযোগী হলেন। প্রথমেই তিনি চুরি-ডাকাতি কঠোর হাতে দমন করলেন। তারপর তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দিলেন।

৩. উদ্দীপকের মুসা মুহম্মদ 'রসুলের দেশে' ভ্রমণ কাহিনীর কোন চরিত্রের সাথে তুল্য?

ক. মুহম্মদ (স.)
খ. আব্দুল ওহ্হাব
গ. আব্দুর রহমান
ঘ. আব্দুল আজিজ

৪. তুলনাটি যে কারণে গ্রহণযোগ্য তা হলো–

i. তারা বিপ্লবী চেতনার প্রতিভু
ii. মানব কল্যাণই তাদের সাধনা
iii. সমাজ সংস্কারে তারা নিবেদিত প্রাণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলার মুসলমান যখন অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে হাবু-ডুবু খাচ্ছিল তখন আবির্ভাব ঘটে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র। তিনি জীবন থেকে সকল কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে ধর্মের প্রকৃত আলোয় আলোকিত হবার আহ্বান জানান। তিনি মানুষের প্রকৃত অধিকার সম্পর্কেও সচেতন করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি ও এদেশীয় জমিদারদের শোষণমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও তিনি এ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করায় ভূমিকা রাখেন।

ক. কোন শতাব্দীতে আরবের বুকে "অজ্ঞতার ভয়বহ অন্ধকার" বিরাজ করছিল ?

খ. আযাইনার আমির কেন আব্দুল ওহ্‌হাবকে আপদ মনে করলেন ?

গ. উদ্দীপকের হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র 'সংস্কারমূলক' কাজের সঙ্গে 'রসুলের দেশে' ভ্রমণ কাহিনীর কার কাজের তুলনা করা যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র 'চেতনার' সাথে 'রসুলের দেশে' গল্পের আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গতিপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ কর ।

ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত

মুহম্মদ আবদুল হাই

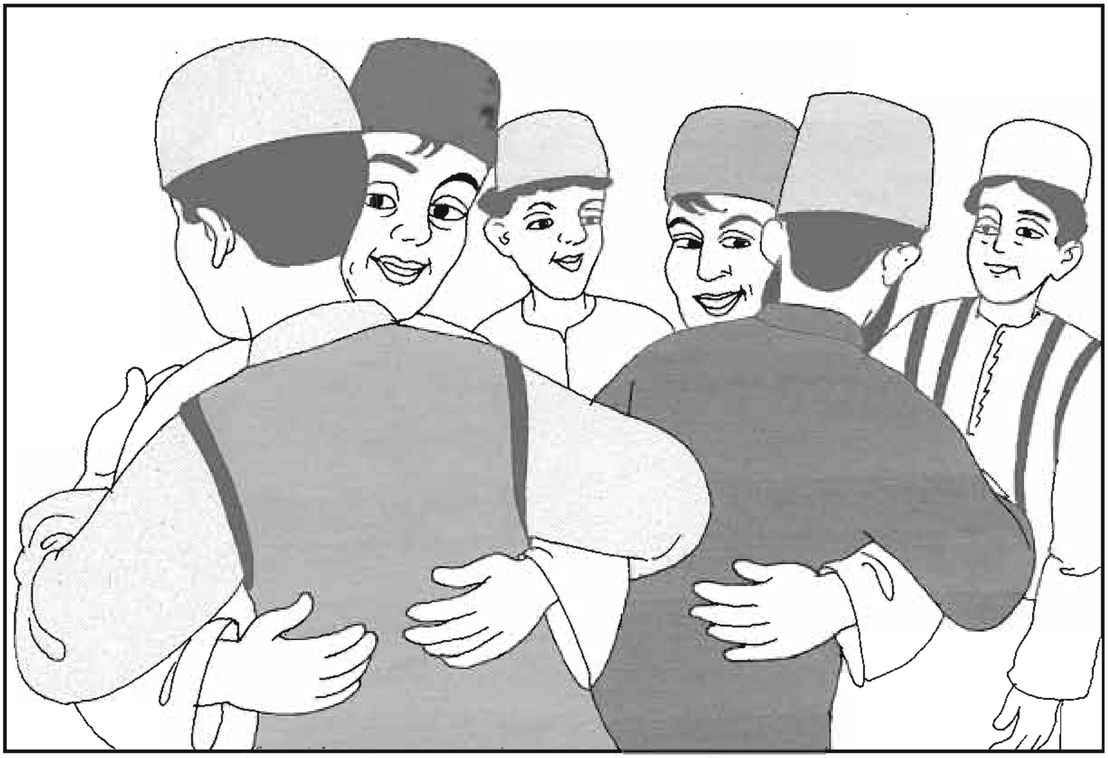

লন্ডন পৌঁছার দুদিন পরেই আমরা বকরা ঈদের নামায পড়তে গেলাম লন্ডন থেকে মাইল তিরিশেক দূরে ওকিং মসজিদে। লন্ডনে মুসলমানদের আরও কয়েকটি মসজিদ আছে। কিন্তু ওকিং সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদ।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবে। মসজিদ কমিটির সৌজন্যে অন্তত একটি বেলার জন্য সিদ্ধ খাবারের দেশে রসনা পরিতৃপ্তিকর মুসলমানি খানা খাওয়া যাবে। আরও দেখা যাবে দুনিয়ার নানা জাতির মুসলমানকে–এক ঢিলে এতগুলো পাখি মারা যাবে দেখে লন্ডন প্রবাসীরা তো বটেই, এমনকি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী মুসলমানরাও ঈদের দিনটিতে ওকিং-এ নামাজ পড়তে আসে।

মুসলমানদের ঈদের নামাযের ধর্মানুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও একটা বড় দিক আছে। সেটা হলো তার সামাজিক দিক। এর মাধুর্য ও সৌন্দর্য কম নয়। এক আল্লাহ ও রসুলকে কেন্দ্র করে এক ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে কী করে একত্র করেছে; ছোট্ট এ ওকিং মসজিদের প্রাঙ্গণে তার অপরূপ রূপ দেখে সত্যিই মন চমৎকৃত হয়। ঈদের দিনে ওকিং-এ এসে নানা জাতের মুসলমানদের মিলনে জামায়াত ও মিল্লাতের এ দিকটা এত করে চোখে পড়ে যে, অমুসলিমও তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

এখানে এসে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। ইসলাম ধর্ম যে জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম। মিসর, আরব, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং আফ্রিকার বহু মুসলমান এসেছে। আর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আমরা তো অনেকেই ছিলাম। এক-এক দেশের লোক দেখতে এক-এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেহারা ও শরীর অথচ ঈদের নামায পড়তে এসে সব দেশের মুসলমানই ধর্ম বাঁধনে ভাই ভাই হয়ে গেছে। নামায শেষে চেনা-অচেনা নানা দেশের মুসলমানের কোলাকুলি দেখে কী যে আনন্দ পাওয়া গেল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ কোলাকুলি একদিকে যেমন মুসলমানে মুসলমানে, অন্যদিকে তেমনি জাতিতে জাতিতে।

নামায হলো আরবিতে। কিন্তু ইমাম সাহেব খোতবা পড়লেন সকলের বোধগম্য ভাষা ইংরেজিতে। যাদের কাছে খোতবা পড়া হয়, তাদের ইসলামের সারকথা বোঝানোই খোতবার অর্থ। ওখানে নানা দেশের নানা লোক এসেছিল। এরা মোটামুটি সকলেই ইংরেজি বোঝে। খোতবায় ইমাম সাহেব বুঝাচ্ছিলেন। সকলের শোনার ধরন দেখে মনে হলো সকলেই তা বুঝছে। ইংল্যান্ডের মতো আমাদের দেশের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে যদি মাতৃভাষায় খোতবাটা পড়া হতো তাহলে অনেক মঙ্গল হতো আমাদের সাধারণ মুসলমানদের।

নানা দেশের অমুসলমানরাও ওকিং-এ এসেছে নানা বেশভূষায়। কেউ দেখতে, আর কেউ বন্ধুদের নেমন্তন্ন খেতে। ইংরেজরা সিদ্ধ ছাড়া তো কিছু খেতে জানে না। এ সুযোগে তাই এখানকার প্রবাসী মুসলমানেরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের মুসলমানি খাবার খাইয়ে বন্ধুত্ব গাঢ় করে।

নামাযের পরে নামাযের তাঁবুতেই মসজিদ কমিটির তরফ থেকে কয়েকবারে হাজার দেড়েক লোক খাওয়ানো হলো। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম পোলাও আর কালিয়া। ওকিং-এর এ খাওয়ার মধ্যে আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলমানদের হাতে জবাই করা টাটকা গোশত ঈদের নামাজ উপলক্ষে একটি দিনের জন্য এখানেই পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের গোশতের মোটা ভাগ আসে আর্জেন্টিনা থেকে। বিদেশ থেকে যে গোশত ইংল্যান্ডে আসে জবাই হবার পর থেকে মানুষের পেটে গিয়ে পৌঁছুতে তার তিন-চারটে মাস সময় লেগে যায়।

ঠাণ্ডা দেশ বলে গোশত নষ্ট হয় না। এর উপরে আছে রেফ্রিজারেটার আর বরফ। দোকানে দিনের পর দিন এ গোশত ঝুলতে দেখা যায়। সুতরাং ঈদের দিন সাধারণ মুসলমান টাটকা গোশত খাবার আনন্দ মেটায়। আর ধর্মভীরুরা বহুদিন রোজা থাকার পর হালাল গোশত খাবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর কাছে এখানে শোকর গোজার করে।

পৃথিবীর জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশবার ও বিচিত্র শোভা দেখবার সুযোগ পাই লন্ডনে। আজকের দিনে আরও শোভা দেখলাম মুসলমান জগতের। লন্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটান শহরগুলোর অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে লন্ডন শহর দুনিয়ার নানা দেশেরই স্নায়ুকেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। এখানে নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে। নানা কিছু শিখতে ও দেখতে। তাই ইংল্যান্ড ভরে আছে নানান দেশের মুসলমানেও।

ইসলাম বিশেষ কোনো একটি জাতির ধর্ম নয়। নানা জাতি, নানা দেশ এ ধর্মের বাঁধনে কী অদ্ভুতভাবে বাঁধা পড়েছে– এখানকার ঈদের দিনে ওকিং তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। ওকিং মসজিদের সামনে বিরাট শামিয়ানা খাটানো হয়। তার চারধার দিয়ে এক-একটা মুসলিম দেশের পতাকা টাঙানো হয়। পতাকাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালেই সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ,

৫১০৮

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সউদি আরব, ইয়েমেন, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, জর্দান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মরক্কো প্রভৃতি দেশের এক-এক নিশান আকাশে উড়ছে। আর মাটিতে এক-এক দেশের অপূর্ব পোশাক-পরিচ্ছদ ভূষিত এক-এক রকম চেহারার নর-নারী। তার মধ্যে আফ্রিকার নিগ্রো মুসলমানের পোশাক-পরিচ্ছদই অদ্ভুত ধরনের। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা, চীন ও জাপানের পীত জাতের মধ্যে যেমন রঙের সুষমা রক্ষা করেছে, তেমনি মরক্কোর মুসলমানেরা ইউরোপের শ্বেত জাতির সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে রঙের দিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। মাঝখানে আমরা বাঙালিরা না কালো না ফরসা। কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোরা জমকালো। ওকিং-এ দেখলাম নানান জাতির ক্লাস, পোশাক আর নানা জাতির নানা রং। এত বৈষম্য অপূর্ব সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন হচ্ছে এক আল্লাহ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এ ধ্বনিবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। লন্ডনে অধ্যয়নকালে সেখানকার জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন'। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো; 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব', 'রাজনীতি ও তোষামোদের ভাষা'।

সারসংক্ষেপ

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। সে সময় তাঁকে সাড়ে সাতশ দিন বিলেতে কাটাতে হয়েছিল। প্রবাসজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের সামান্য একটু অংশ হচ্ছে 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত'। লন্ডনের মতো কসমোপলিটান শহরেও কী সুন্দর ও আনন্দদায়ক ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়, তারই একটি সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব এক সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছে বিশ্বের সকল মুসলমান; আর সেটা হচ্ছে ধর্মানুভূতির বাঁধন।

শব্দার্থ ও টীকা

ধর্মানুভূতি — ধর্মের জন্য অনুভূতি। প্রাঙ্গণ — অঙ্গান, উঠান। চমৎকৃত — বিস্মিত। **সৌজন্য** — ভদ্রতা। **চাক্ষুষ** — নিজের চোখে দেখা, প্রত্যক্ষ। **হালাল** — মুসলমান ধর্মমতে বৈধ বা পবিত্র। **খোতবা** (খোৎবা)— ইসলামের বিজয় ঘোষণা। **কসমোপলিটান** — বহুজাতিক, বহু জাতের সমাবেশ। দৃষ্টান্ত — উদাহরণ।

২০১৯

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লেখক ওকিং মসজিদে কোন নামাজ আদায় করতে উপস্থিত হয়েছিলেন?

ক. বকরা ঈদের খ. ঈদুল ফিতরের

গ. জুমআর ঘ. তারাবীর

২. নামাজ শেষে খাওয়াটা অনেক তৃপ্তির মনে হয়েছিল কেন?

ক. রান্নাটা মজা হয়েছিল

খ. অনেকে একসঙ্গে খেয়েছিলেন

গ. গোশত সংরক্ষিত ছিল

ঘ. খাবার ছিল বিচিত্র রকমের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিভিন্ন দেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করেছে। চৈতী কবিতা আবৃত্তি খুব পছন্দ করেন। তিনি জাপান, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসি ও আরবি কবিতার আবৃত্তি শুনে তেমন মজা পেলেন না। কিন্তু বাংলা কবিতায় আবৃত্তি শুনে আবেগে তার চোখ ভিজে এলো।

৩. চৈতীর বাংলা ভাষায় আবৃত্তি শোনার ব্যাপারটিকে কোনটির সঙ্গে তুলনা করা যায়?

ক. বিভিন্ন দেশের মানুষের পোশাক

খ. বিভিন্ন আকৃতির মানুষের সমাগম

গ. ইংরেজি ভাষায় খোতবা পাঠ

ঘ. সুস্বাদু খাবারে পরিতৃপ্ত আহার

৪. যে কারণে তুলনাটিকে যৌক্তিক মনে করা যায় তা হলো–

i. বোধগম্যতা

ii. স্বদেশিকতা

iii. জীবনোপযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমরা সবাই রংধনু দেখেছি। সাতটি স্বতন্ত্র রঙের কী সুন্দর বিন্যাস! বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল– ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। একই আকাশে একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে সাম্যের বন্ধনে কী সুন্দর অবস্থান!

ক. ‘কসমোপলিটান’ শব্দটির অর্থ কী ?

খ. মুহম্মদ আবদুল হাই মাতৃভাষায় খোতবা পড়ার জন্য কেন গুরুত্ব দিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের রং-বৈচিত্র্য ‘ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত’ ভ্রমণকাহিনীর যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “রংধনুর রঙের সাম্যের বন্ধনের মতো জীবনও সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে।” ‘ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত’ ভ্রমণকাহিনীর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৫

২০১৯ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ-আনন্দপাঠ

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য